ত্রিশটী স্ত্রীর পত্র

শ্রীভট্ট
১৭।৫।২০২১- ৭।৯।২০২৪
নাগপুর

DO NOT COPY

মুখবন্ধ

স্ত্রী মানে এমনিতেই মুখ বন্ধ । তাকে লেখা চিঠিতে মুখবন্ধ ! একটু অতিরিক্ত হয়ে গেল না ?
কিন্তু শ্রীভট্টর ধনুর্ভাঙ্গা পন । লিখবেই চিঠি ত্রিশটি, ত্রিশটি স্ত্রীকে !!
আদৌ না । নামকরনটা তোমাকে একটু রাগানোর জন্য । তুমি তো শুনেই আগুন । তোমার তিরিশটি স্ত্রী ? আগে বলোনি তো ?
আসলে নামকরন হওয়া উচিত ছিল স্ত্রীকে লেখা ত্রিশটি পত্র ।
ইচ্ছে করেই বদলায়নি নামটা । তুমি ছাড়াও অন্য পাঠক/পাঠিকারা যদি পড়ে ? বিষয়টা একটু চিত্তাকর্ষক হবে । শুরু থেকেই ওদের ঔৎসুক্য বেড়ে যাবে । কি বল ?
পত্রগুলির মাত্রা এবং তোমার মুখের ক্রোধদীপ্ত ছদ্ম হাসি দুটোই যাতে বৃদ্ধি পায় সেই কারনে প্রতিটি পত্রের সম্ভাষন ভিন্ন ভিন্ন রাখা হয়েছে ।
পত্রপ্রাপ্তি ডাকযোগে পাঠিও ।

শ্রীভট্ট, নাগপুর
৭।৯।২০২৪

DO NOT COPY

কৈফিয়ৎ

আসলে চিঠি লেখার অভ্যেস নেই। আগে ছিল, সে অনেকদিন আগে। এখন নেই। আজকের গতিশীল যান্ত্রিকযুগে চিঠি লেখা অবলুপ্তপ্রায়।

একদিন বসে ভাবছিলাম তোমাকে যদি চিঠি লিখতে শুরু করি কেমন হয়।

কি লিখি তোমায় ? নতুন কিছু, নতুন কথা, নতুন ক'রে। আবার মনে হয়েছে যে কথা বহুবার বলা, শোনা, আলোচিত সেগুলোকে লেখাবন্দী করলে কেমন হয়।

শুরুর মুহূর্তে ভেবেছিলুম জন্মদিনে উপহার দেব। সেও অনেক বছর হয়ে গেল।

লেখা আর হয় না। লিখতে বসাও হয় না। ভেবেই মরি। মনে মনে কত চিঠি লিখি, খাতাতে লিপিবদ্ধ করা আর হয় না।

এছাড়া আছে পেশাগত কাজের আঘাত ; অনেক সময় এমনি এমনি, কখনো বা বাধ্যতামূলক।

দীর্ঘসূত্রিতার কারনেই এত বিলম্ব। শুরুর এবং শেষের পত্রের সন-তারিখেই মালুম হবে।

তবে একটা কথা লক্ষ্য কোর, পত্র শুরু ভালোবাসা দিয়ে, শেষেও সেই প্রেমের বানী, তোমায় ভালোবাসি।
ভালো থেকো।

শ্রীভট্ট
৭।৯।২০২৪

DO NOT COPY

বিষয়সূচী

পত্র ক্রমাং	পত্রাবলী
১	তোমায় ভালবাসি
২	কি করে ভোলা যায় ?
৩	কি লিখি তোমায় ?
৪	সাফল্য মাপা যায় ?
৫	কাজের লোক
৬	আমার বই পড়ার অভ্যেস
৭	পুত্রপ্রাপ্তি
৮	মামাবাড়ীর আবদার
৯	দেশ ছেড়ে বিদেশে
১০	ধর্ম তিষ্ঠতি কেবলম্
১১	যার সাজে সে....
১২	কি বলি, কি না বলি
১৩	বীর সাওয়ারকর
১৪	জীবনটা পদ্যও তো হ'তে পারে
১৫	শিক্ষাদান
১৬	লক্ষী এল ঘরে
১৭	পাখীর কলকাকলি
১৮	বাড়ীর চার পুরুষ
১৯	জননী জন্মভূমিশ্চ.....
২০	পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম
২১	গুরুদেব দয়া কর দীনজনে
২২	ওঁম সাঁই
২৩	আসামের গল্প
২৪	গৃহস্থের গৃহপ্রবেশ
২৫	পাখীর পেটে প্রথমবার
২৬	মাষ্টারমশায়ের মাষ্টারী
২৭	পাঁচপুরুষের পাঁচকাহন
২৮	কর্তামশায়ের কত কথা
২৯	আমার মার মামাবাড়ী
৩০	তোমায় কেন ভালোবাসি

DO NOT COPY

প্রথম (১)
প্রসঙ্গ: তোমায় ভালবাসি

প্রিয়েষু,

বেশ মনে পড়ে বেশীরভাগ লেখকদের ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাস পাঠে আমায় সবচেয়ে বেশী আকর্ষিত করেছিল কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র । কারন বলা কঠিন । আসলে উনি স্ত্রীচরিত্রগুলো খুব ভালো ফুটিয়ে তুলতেন । আমার সেটা খুব ভালো লাগতো। এখনো লাগে । মহিলা অধ্যুষিত ছেলেবেলা কাটানোর ফলে মেয়েদের প্রভাব বোধহয় বেশী আমার উপর । এই কারনেই পরবর্তী কালের আশুতোষ মুখুজ্যের উপন্যাসগুলোও আমার খুব পছন্দের ।

সে যা বলছিলাম । সম্প্রতি শরৎ উপন্যাস আবার পড়তে শুরু করেছি । বড়গল্প 'বড়দিদি' পড়ার পরে শ্রীকান্ত ধরেছি । 'অভয়া' পড়তে গিয়ে একজায়গায় চোখ আটকে গেছিল। প্রতিদিনই ভাবি এ বিষয়টা নিয়ে তোমাকে লিখি । হয় আর না ।

শরৎচন্দ্র একজায়গায় যা বোলেছেন, তার অর্থ । অর্থ কেন, quote ই করে দি ওনাকে ।

".....দুঃখ জিনিষটা অভাব নয়, শুন্যও নয়। ভয় ছাড়া যে দুঃখ, তাকে সুখের মতই উপভোগ করা যায়।" (শ্রীকান্ত)

সত্যি কথা । বলা সহজ, করা কঠিন । কি সুন্দর সুন্দর কথা বোলেছেন অভয়ার মুখ দিয়ে । সেই সেকালে । ভাবতে অবাক লাগে ।

শ্রীকান্ত ফিরে এল বর্মা থেকে । রাজলক্ষীর ডাকে । রাজলক্ষীর অনেক অনুযোগ। শ্রীকান্ত কেন রোগা এবং দুর্বল হয়ে গেছে ইত্যাদি, ইত্যাদি।

রাজলক্ষীর প্রসঙ্গ কেন উঠল বলি তোমাকে । শ্রীকান্ত ভীষন ভালোবাসে রাজলক্ষীকে । কিন্তু প্রতিবারই ব্যথা পায় ; লক্ষী আঘাত দেয় তাকে । আমারও মাঝে মাঝে বোধহয় যে তোমাকে খুব ভালবাসি এ ব্যাপারটা তুমি বুঝতেই পার না । তুমি seriously নাও না ব্যাপারটা ।

শ্রীকান্তর মুখ দিয়ে সেটায় শরৎচন্দ্র বলেছেন । আমার মানসিকতার সাথে বেশ মিলে যায় । শ্রীকান্ত রাজলক্ষীর নিকটে যেতে গিয়ে আঘাত পেয়ে নিজের মনেই ভাবছে...।

" এটা আমি বহূবার দেখিয়াছি, সে (রাজলক্ষী) আমার এই ধরনের কোন প্রশ্নই (আমি তোমাকে ভালবাসি) সরলচিত্তে গ্রহন করিতে পারে না । আমিও যে তাহাকে অকপটে ভালবাসিতে পারি, কিংবা তাহার সংস্রবে স্থির হইয়া বাস করিতে পারি, ইহা কিছুতেই যেন তাহার মনের সঙ্গে গাঁথিয়া এক হইয়া উঠিতে চাহে না। সংশয়ের আলোড়নে অবিশ্বাস একমুহূর্তেই এমন উগ্র হইয়া বাহিরে আসে যে, তাহার জ্বালা বহূক্ষন অবধি উভয়ের মনেই রি রি করিয়া জ্বলিতে থাকে । এই অবিশ্বাসের আগুন যে কবে নিবিবে এবং

কেমন করিয়া নিবিবে, আমি তাহার কোন কিনারাই ভাবিয়া পাই না ।" (শ্রীকান্ত)

I don't want to mean অবিশ্বাস । Situation টাও আলাদা । Just quote কোরলাম ।

পরের চিঠিতে আবার অন্য প্রসঙ্গ । ভালো থেকো ।

অলমিতি ।
নাগপুর
(২৭।৬।২০২১)

DO NOT COPY

দ্বিতীয় (২)
প্রসঙ্গ: কি করে ভোলা যায় ?

প্রিয়ে,

আমার মনেই নেই শেষ কবে চিঠি লিখেছি তোমাকে । স্ত্রীকে ত্রিশটী পত্র রচনা কোরে তার করকমলে দেব , হঠাৎই ইচ্ছে হোল । দেখ, ভাবা এক, লেখা আর এক । লিখব লিখব কোরে এমন procrastination ! মানে দীর্ঘসূত্রিতা আর কি । কি বলব আর !

এই কোরে কোরে কি হয় জান ? অনেক লেখা মাথায় বুদ্‌বুদের মত এসে তার পর কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে যায়, কে জানে ।

মাঝে একটা social media post এ share কোরেছিলাম forgive and forget বিষয়ে । জানো, ওটা আমি save কোরে রেখেছি। ভীষন ভাবে নাড়া দিয়েছে বিষয়টা ।

এমনিতে দেখ "ক্ষমা হি পরমম্ সুখম্ ", এটা জানা । অনেককে বহূকাংশে ক্ষমা কোরেও দিয়েছি । কিন্তু যখন বলা হচ্ছে তুমি তোমার মাকে. বাবাকেও ক্ষমা কোরে দাও, বিষয়টা ভাবায় ! মা বাবা তো মা বাবা; তাদের আবার ক্ষমা কি ?

আমি আমার জীবনে অনেক কিছু দেখেছি । আমার মা বাবার বিষয়ে বলছি । যেগুলো অনুমোদনযোগ্য নয় । কিন্তু ওনাদেরও ক্ষমা করে দিতে হবে, একথা কখনো মনে আসেনি ।

মনে আছে অভাবের সংসারে আমার মা একবার রেগেমেগে আমার টেবিল থেকে সমস্ত বই-খাতা বাইরে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন । সবার সামনে । কি কান্না কেঁদেছিলাম , লিখে বোঝাতে পারব না । সবার সামনে এই অপমান । কেউ আসেনি আমাকে সমবেদনা জানাতে । ১৯৭২ এর কথা । কখনো তোমাকে বলিনি । সবচেয়ে বেজেছিল এইজন্য যে বইগুলো আমার নিজের ছিল না । কেনার ক্ষমতায় ছিল না আমাদের । ওগুলো সব ধার করে আনা বই । বই এর পাতাতে জল লেগে গেছিল । অনেকগুলো পাতা খুলেও গেছিল ।

খুব কষ্ট পেয়েছিলাম । কখনো ভুলিনি । এরজন্য অবশ্য মা'র প্রতি কর্তব্যে কখনো অবহেলা করিনি ।

সেদিনের ঐ post টা পড়ে মনে হল সত্যি তো মা-বাবার অপরাধটাও ক্ষমা করে দেওয়া উচিত । ভুলে যাওয়া উচিত ।

ঐ post এ আর একটা কথাও ছিল । নিজেকে নিজে ক্ষমা করে দিও । "অনেক দোষ করেছ তুমি । জীবনের পথে চলতে চলতে বহূ অপরাধ করেছ । কতদিন সেই বোঝা বয়ে বেড়াবে ? নিজেকেও নিজে ক্ষমা করে দাও ।" কি অদ্‌ভুত কথা ! তাই না ?

সবচেয়ে মারাত্মক আর একটা বিষয় ছিল । বলছে, যে ভগবানের উদ্দেশে নিয়ত প্রনাম কর , তিনি হয়ত তোমার অনেক ইচ্ছে পূর্ণ করেন নি ।

তুমি সেই ভগবানকেও ক্ষমা করে দাও । এরপরে তো আর কোনো কথায় নেই । Last word ।

আমি এমনটা আগে শুনিনি গো । সত্যি বলছি । আমি তাই সবাইকেই ক্ষমা করে দিলাম । ক্ষমা তো করে দিলাম, ভুলে গেলাম কি ? না, ক্ষমা করে দেওয়া হল বটে, তবে বিষয়টা ভোলা যাবে না । কদাপি না ।

মনে হোল তোমাকে লিখি । এ'রকম ভাবব্যাঞ্জনাপূর্ণ অভিব্যক্তি মরনশীল মানুষ পারে কি কোরতে ? চেষ্টা কোরতে দোষ কি ?

তুমি কি বল ?

ভালবাসা জেন ।

অলমিতি ।

নাগপুর
(১৭।৫।২০২১)

DO NOT COPY

তৃতীয় (৩)
প্রসঙ্গ: কি লিখি তোমায় ?

প্রিয়তমা,

মনে হয়, লিখি আর লিখি । কি লিখি ?

অনেক কষ্টে পেশাগত পেশার নিবিড় pressure এ নিষ্পেষিত হ'তে হ'তে নিজেকে যেন মুক্ত করেছি । সত্যি ?

Difficult । কিন্তু মনে হ'চ্ছে সামলে নেব । কারন তুমি আছ ।

গত চিঠিতে ক্ষমা করা এবং ভুলে যাওয়া প্রসঙ্গে লিখেছিলাম । এর উপরে একজনের লেখা একটা বই কিনে পড়ে ফেললাম । ইংরিজিতে লেখা ।

Someone asked, "What is forgiveness?" A little boy gave a lovely reply, "It is the wonderful fruit that a tree gives, when it is being hurt by a stone".

এটা কিন্তু শুধুমাত্র ক্ষমার বিষয়ে । ভুলে যাওয়াটা কঠিন । লেখক সেই জন্যই লিখছেন forgive এবং forget দুটো সম্পূর্ন আলাদা । তুমি ক্ষমা করে দেবে । কিন্তু ভুলবে না । ভুলে যাওয়া অসম্ভব । ক্ষমার ওষুধ ভুলে-যাওয়া-বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারবে না । কখনোই না ।

আমার মনে হয় ক্ষমা করে দিয়ে বিষয়টার ইতি করে দেওয়ায় ভালো ।

তুমি কি বলো ?

অলমিতি ।

নাগপুর
(১৮।১১।২০২১)

DO NOT COPY

চতুর্থ (৪)
প্রসঙ্গ: সাফল্য মাপা যায় ?

প্রিয়তমাষু,

বেশ মনে আছে নাগপুরের ভরতনগরের এক দোতলা ভাড়াবাড়ীর একতলাতে থাকতাম । ১৯৮৯ এর কথা । কেউ ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে বলতাম "সাফল্য" । আসলে মালিক বাড়ীর ঐ নামটায় রেখেছিল । মজা করে অনেককে বলতাম , থাকি সাফল্যে, কিন্তু তার চাবিকাঠি এখনো খুঁজে পাইনি ।

ভাববার কথা । সারাজীবন ধ'রে প্রত্যেকে সফলতার পিছনে দৌড়চ্ছে । Rat race । কেউ চাবি খুঁজে পায়, কেউ পায়না ।

যারা পায়, সত্যি পায় । সাফল্যের মাপকাঠি কি ? কি ক'রে বুঝব কে সফল, কে ব্যর্থ ।

বাদশা কি তাজমহল বানিয়ে সফল ? মানুষ চাঁদে গিয়ে সফল ?

আমার কেমন মনে হয়, বিষয়টা আপেক্ষিক । । mean relative । রবীন্দ্রনাথ তো নিজেই শা'জাহান লিখতে গিয়ে বলেছেন, আমরা কেন মনে করি সবকিছুতে আমাদের স্বাক্ষর রেখে গেলে লোক সেটা মনে রাখবে জন্ম জন্মান্তর ধরে ! সাফল্যের ব্যাখ্যা লোক নিজে নিজের মত করে ।

একটা মজার ঘটনা বলি তোমায় । তুমিই ঠিক কর, কে সফল, কে নয় ।

অনেকদিন পরে দেখা । দুই বন্ধুর । স্কুলে একসাথে পড়ত । মাঝে হ'ল ছাড়াছাড়ি । প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরে পার্কে হঠাৎ দেখা ।

প্রথমে তো চিনতেই পারে নি একজন আর একজনকে । পক্ককেশ বৃদ্ধ একজন । গালে খোঁচাখোঁচা দাড়ি । অন্যজন বেশ ছিমছাম । Relatively smart এবং দর্শনধারী ।

পার্কের বেন্‌চে কথায় কথায় পরিচয় ।

--ওমা তুই ?

--হ্যাঁ, আমি । তুই তো পরিতোষ ?

-- হ্যাঁ, আর তুই আশু, তাই তো ?

আলাপ পরিচয় তো ছিলই । তাও অতীতের কথা বেশী হোল । School এর গল্প । মাষ্টারমশায় । দুষ্টুমি । Teasing teachers ।

অনেক পরে বর্তমানে এলেন দুজনে । বৃদ্ধ পরিতোষ বললেন তার গল্প । ভাড়া বাড়ীতে থাকেন । সাথে স্ত্রী । একমেয়ে । বিয়ের পরে বিদেশে settled । তিন ছেলের প্রত্যেকেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত । অন্য শহরে থাকে । নাতি-নাতনী নিয়ে পূজোর দিনগুলো ভালোই কাটে । দু-তিনবার মেয়ের কাছে বিদেশেও ঘুরে এসেছেন ।

DO NOT COPY

--বেশ স্ফুর্তিতেই আছি, বুঝলি আশু ? একটা কাজই করে উঠতে পারিনি । নিজের বাড়ী নেই আমাদের । সারাজীবন ভাড়া বাড়ীতেই কাটিয়ে দিলাম । তোর খবর বল্ ?

--আমার তিনটে বাড়ী আছে । ভালো bank balance । স্ত্রী গত হয়েছেন । তিনটি মেয়ে । এক ছেলে । মেয়েদের বিয়ে হয়নি । ছেলেটা ভালো করে পড়াশুনো করে নি । একটু বখাটে । কথায় শোনে না । মেয়েরাও বিয়ের ব্যাপারে রাজী নয় । এই নিয়ে আছি আর কি । গাড়ী বাড়ী টাকা পয়সার অভাব নেই । ছেলে-মেয়েগুলো settled হয়ে গেলেই চিন্তামুক্ত হতে পারি । দ্বিতীয়জনের উত্তর ।

বল তো, পরিতোষ আর আশুর মধ্যে কে বেশী সফল জীবনে ? জীবন শুরু তো একসাথেই করেছিল দুজনে । আজ কে কোথায় ?

বল না ? চুপ করে আছ কেন ?

অলমিতি

নাগপুর

(২২।১১।২০২১)

DO NOT COPY

পঞ্চম (৫)
প্রসঙ্গ: কাজের লোক

সুপ্রিয়ে,

বাড়ীর কাজের লোক নিয়ে ছেলেবেলার অনেক কথা মনে পড়ে যায় । একজন ছিলেন হালিসহরের (West Bengal) মঙ্গলা মাসী । সে যে কী পরিশ্রম করত বলে বোঝানো যাবে না ।

তখন স্কুলে পড়ি । পৈতে হয়েছে । শীতকাল । কূয়োর জলে স্নান সেরে গামছা দিয়ে গা মুছছি । মাসী বললেন, তুমি সরে যাও ওদিকে । বললাম , কেন? বলে, যাও না, বাবা । আমিও বদমাশ । স'রলামই না । মা রান্নাঘর থেকে বেড়িয়ে এলেন । একমূহুর্তে বুঝে ফেললেন । আমাকে বললেন, তুই ওদিকে সরে যা । তোর ছায়া পড়ছে । ও বামুনের ছায়াতে পা দেবে না ।

নিজের জীবনের কথা বলছি । নিজের অভিজ্ঞতা ।

আর একজন ছিলেন কাজের লোক । মার খুব ন্যাওটা ছিল । নরেশের মা । অনেক পরে জেনেছি নরেশ ওর নিজের ছেলের নাম । যাক গে , সে কথা পরে ।

বাঙ্গাল ছিল । কাঠ বাঙ্গাল । বলত, নরেশ্যার মা । আমাদের ছোট্ট রান্নাঘরের বাইরের দিকে একটা দরজা ছিল । মা রান্না করার সময় দরজাটা খুলে রাখতেন । হঠাৎ করে করে নরেশ্যার মার আবির্ভাব হত । মার সাথে তার বাক্যালাপ ছিল শোনার মত । আর এটা একদিনের কথা না । ব্যাপারটা প্রায়শই হত ।

--ও রানিদি কচুর শাক নিবেন ? কচুর লতি ? কলমী শাক ?

রানিদি মানে মা ; ভীষন রেগে যেতেন । Frankly speaking ও যেগুলো নিয়ে আসত ওগুলো আমাদের দৈনন্দিন খাবারের তালিকাতেই থাকত না । থাকলেও খুব কম । আসলে ওরা কি করত , আশেপাশের জলা জায়গা থেকে ওগুলো তুলে আনত । কেউ কিনলে দু'চার পয়সা পেত । যা লাভ হয় আর কি ।

মা'র থাকত অফিসের ভাত দেওয়ার তাড়া । বাবার অফিসের ভাত , টিফিন । ইস্কুল, কলেজে যাবে ছেলেমেয়েরা তাদের ভাত , টিফিন । মার তখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা । বলতেন, লাগবে না , তুমি যাও এখন । মা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন । এখন দরজা তো খোলা । মা'র অত হূঁশ থাকত না । অনেক পরে তাকিয়ে দেখেন, নরেশের মা তখনো বসে আছে।

--তুমি যাওনি এখনো ? যাও, যাও । এখন আমার কথা বলার সময় নেই ।

--রানিদি, কি পাক করেন ?

--কেন, তোমার কি দরকার ?

DO NOT COPY

--না, জিগাইতেসি, রাগেন ক্যান ?

অনেকক্ষন চুপচাপ । মা কাজে ব্যস্ত । হঠাৎই কান্নার আওয়াজ । মা আরো রেগে যান ।

--আ মোলো, কাঁদছ কেন ?

--খিদা পাইসে ।

--হ্যাঁ রে, তোর কি আমার বাড়ী আসলেই খিদে পায় ?

নরেশের মা চুপ । কেউ কিছু দেয় না খেতে । বড় আশা করে নরেশের বিয়ে দিলাম । আমি গরীব বিধবা । বৌ খেতে দেয় না । বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয় । নরেশকে বললে সে বৌয়ের কথা শোনে । আমার কোন কথায় শোনে না ।

জানো, এসব কথার শেষ নেই । কত বলব । মা একটু ভাত, ডাল দিলেন । খেতে খেতে নরেশের মা বলে ওঠে,

--রানিদি, ভাতের ফ্যান ফালায় দিসেন নাকি ?

--না, কেন ?

--আমারে দেন না, আমি খামু । প্যাটটা ভরবো তাইলে ।

মা ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু মহিলা । মা আলাদা একটা বাটীতে ফ্যান দিলেন । আবার নরেশের মার আওয়াজ ।

--ও রানিদি, একটু লবন দ্যান দেহি ।

মা নুন দিলেন । আবার আওয়াজ এল ।

-- ও রানিদি, লবন কটা হইসে । আর দু'গা ভাত দিবেন ?

জানো, আমি এসব নিজের চোখে দেখেছি । তখন কতই বা বয়স আমার ! আমি দারিদ্র নিজের চোখে দেখেছি । কি নিদারুন কষ্ট ।

এই নরেশকে দূর থেকে দেখেছিলাম । জানতাম না ও আমাকে চিনত । চেহারাটা আবছা মনে আছে । বেশ লম্বা । ধুতি আর হাল্কা নীল রঙ্গের শার্ট । কদমছাট চুল।

আমি তখন অন্য কাজে ব্যান্ডেল-হাওড়া section এ train এ যাতায়াত ক'রতাম । হঠাৎ একদিন চলন্ত ট্রেনে দেখি নরেশ চানাচুর বিক্রি করছে । আমাকে দেখেই কামরা থেকে নেমে গেল । সেদিন আর তাকে ট্রেনে দেখিনি ।

বাড়ী এসে মাকে বলেছিলাম । মা বললেন, হ্যাঁ, জানি । আমাদের শেয়ালদহের ট্রেনে ও ফিরি করে না। চেনাশুনো আছে বলে avoid করে । ব্যান্ডেল লাইনে চেনাশুনো লোক কম । ওদিকেই বিক্রি করে । তোকে দেখে লজ্বা পেয়ে নেমে গেছে । আগে কোনো factory তে কাজ করত । বন্ধ হয়ে গেছে সে কাজ ।

DO NOT COPY

আমি জানিনা ওরা কোথায় আছে এখন । অনেকদিন আগের কথা । এরকম অনেক গল্প আছে আমার ঝুলিতে, জানো ? অনেক কথা, অনেক কাহিনী । লিখব, ধীরে ধীরে।

খুব কাছ থেকে দেখা এ মানুষগুলোকে কেমন চেনা চেনা লাগে । বাংলার বাইরে এ প্রবাসে এই গরীব লোকগুলোর মুখ বারবার ভেসে আসে।

অনেকদিন আগে একজন আমায় বলেছিলেন, poverty is a curse, you should try to get rid of it । অনেকে দারিদ্র্যকে নিজের অহংকার হিসেবে দেখে ।

তোমার কি মনে হয় ? দারিদ্র্য অভিশাপ না অহংকার ?

অলমিতি ।
নাগপুর
(৯।১২।২০২১)

DO NOT COPY

ষষ্ঠ (৬)
প্রসঙ্গ: আমার বই পড়ার অভ্যেস

সুহাসিনী,

আমি পড়তে শিখি class II তে । তোমাদের ভাষায় standard II ।

Just sentence গুলো সবে বাংলাতে পড়তে শিখেছি । খুলে গেল দরজা, জানলা । তারপর থেকে পড়া আর পড়া ।

বেশ মনে আছে পড়ার আগ্রহ দেখে মা আমাকে local একটা club এর সদস্য করে দিলেন । কিশোর সভ্য হিসেবে আমি বই নেওয়ার অনুমতি পেলুম । সপ্তাহে একবার খুলত সেই library । রবিবারের সকালে । সে আমলে কিশোর সাহিত্য বা ছোটদের গল্প খুব একটা পাওয়া যেত না । পাওয়া গেলেও অধিকাংশ members adult হওয়ায় ছোটদের বই library তে আনতই না । আমি তখন VIIIth standard এ পড়ি ।

প্রথম দিকে ছোটদের বই যত আছে খুঁজে খুঁজে সব শেষ করলাম । তারপর না বুঝেই সমরেশ বসুর কোনও একটা বই নিয়ে বাড়ী এলুম । বইটা পাতলা ছিল । ভাবলাম ছোটদের জন্য লেখা । কারন বড়দের জন্য লেখা বইগুলো সাধারনতঃ মোটা মোটা হত ।

রবিবারে বই আনতাম । মা সারাদিনের কাজ সেরে অপরাহ্নে সময় পেতেন । বালিশে মাথা রেখে জিজ্ঞেস করলেন,

--কৈ দেখি, আজ কি বই এনেছিস ?

মা'র বই পড়ার খুব শখ ছিল । বই দেখালাম । রেগে আগুন । --এই বই এনেছ । তুমি এসব পড়ছ আজকাল ?

দাদাকে ডাকলেন । আদেশ দিলেন,

--তুমি কালই গিয়ে ওর membership cancel কোরে দেবে ।

তাই হোল । আমার library যাওয়া বন্ধ হোল । কিশোর মনে ঘটনাটি ছাপ ফেলেছিল । ছোটদের বই আর বড়দের বই এর তফাৎটা কি ? বড়রা ছোটদের বই পড়তে পারে, ছোটরা বড়দের বই পড়লে কি হবে ? ছোটদের দোষটা কোথায় ?

School এ একজন মাষ্টারমশায় ছিলেন । বিজ্ঞান শিক্ষক । সাহিত্যেও অগাধ পান্ডিত্য । তাঁকে একদিন class এর ফাঁকে গিয়ে ধ'রলাম । সন্তোষবাবুকে জিজ্ঞেস কোরলাম,

-- মাষ্টারমশায় আমি library থেকে একটা বই নিয়ে এনেছিলাম । আমার মা বললেন, এটি বড়দের বই, এ বই পড়ার বয়স তোমার হয় নি । কেন sir, আমি ঐ বই পড়লে কি হবে ?

Sir হাসলেন । মধুর হাসি । পিঠে সস্নেহে হাত রেখে বললেন,

--দ্যাখ্, জীবনটা হচ্ছে dictionary র মতো । Dictionary র সব পাতাগুলো সবসময় বোধগম্য হয় না । জীবনের প্রত্যেকটা phase এর জন্য ভগবান আমাদের জন্য বিশেষ বিশেষ উপকরন তৈরী

DO NOT COPY

রেখেছেন , জীবনের সেই অধ্যায়টাকে উপভোগ করার জন্য । তোর জন্য এখন বরাদ্দ ঐ ছোটদের বইগুলো । যখন বড় হবি তখন বড়দের বই । যে stage এ যে জিনিষ ভগবান নির্দ্দিষ্ট করে রেখেছেন, সেটুকুই এখন উপভোগ কর্ । এখনই যদি বড়দের stage টা উপভোগ করে নিস্ তাহলে এই কৈশোরের মজাটায় মাটী হয়ে যাবে ।

কি সুন্দর কথা, তাই না ? হঠাৎই মনে হোল, তাই share কোরলাম ।

কেমন, ঠিক না ?

অলমিতি ।

নাগপুর

॥ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ ॥

DO NOT COPY

সপ্তম (৭)
প্রসঙ্গঃ পুত্রপ্রাপ্তি

সুভাষিনী,

বেশ মনে আছে অয়নের জন্মের আগে তোমাতে আমাতে গুজরাতে গিয়েছিলাম। ডাক্তার অনুমতি দিয়েছিলেন, অবশ্য জানতেন না যে আমরা জীপে ভ্রমন কোরব।

খুব গরম তখন। গুজরাতের তীব্র জলকষ্টকে তুমি হাসিমুখে সহ্য কোরেছিলে। আমাদের অনেক অসুবিধে সত্ত্বেও কখনো কিছু বলনি তুমি। আমরা ছিলাম জসদানে, পরে রাণপুরে।

সেবারেও April এ নাগপুরে ভীষন গরম। আমি তোমাকে ছাড়তে চায় নি। বললাম, না, বাচ্চা নাগপুরেই হবে। তোমার ডাক্তার ছিলেন মনিকা সেনগুপ্তো। রবিনগর square এ। আমরা তখন কাছেই ভরতনগরের থাকতাম।

কি খাতির, কি খাতির ! কি যত্ন ! মনিকা ডাক্তারনি সবাইকে তুই বলেন। তোর কিচ্ছু ভয় নেই, সব normal, no problem, ইত্যাদি। তুমি পরিচয় দিলে। এক আত্মীয়ের। ও, তুই অমুকের বোনঝি। খাতির আরো বেড়ে গেল।

To cut the story short, ডাক্তারনি সব normal বলতে শেষমেষ operation করালো তোমার। Caesarean। আমার হোল tension। ফলতঃ তোমাকে-promise-করা সিগারেট-ছেড়ে-দেওয়াটা আবার শুরু হোল। Very bad।

প্রচুর পয়সা খসালো ডাক্তারনি। Luckily সেই সময় আমার চাকরীসূত্রে অর্থাগম হয়েছিল। So we were comfortable।

আমাদের নতুন অতিথি এলেন চৈত্র সংক্রান্তীতে। আমার খুড়শ্বশুরের fiat গাড়ীতে চড়ে অয়নের পদার্পন হোলো আমাদের ভাড়াবাড়ীতে।

সেসব 1988 র এপ্রিলের কথা।

মনে পড়ে ?

অলমিতি।

নাগপুর
॥ এপ্রিল, ২০২৩ ॥

DO NOT COPY

অষ্টম (৮)

প্রসঙ্গ: মামাবাড়ীর আবদার

হে সুন্দরী,

সিউরিতে আমার মামাবাড়ী ছিল। হ্যাঁ, ছিল, এখন আর নেই। আমার মায়ের ছেলেবেলা সেখানেই কেটেছিল।

মা'র দাদাম'শায় (আমার দিদিমার বাবা) ছিলেন মস্ত রায়বাহাদুর। ব্রিটিশ সরকারের বিরাট তাঁবেদার। শুনেছি উনি খোঁড়া ছিলেন। শেষ বয়সে বোধহয় সাঁওতালী ভাষায় doctorate করেছিলেন। ধনী ব্যাক্তি। বিরাট বাড়ীর মালিক ছিলেন।

শুনেছি ওনার বাড়ী বানানোর একটা ইতিহাস আছে।

নিচু জমি। বাড়ী বানানোর জন্য উঁচু করতে হবে। সামনে বিরাট পুকুর খুঁড়তে শুরু করলেন। কাজ শুরুর আগে হঠাৎ এক সাধুর দেখা পান। উনি সাধুদের বিষয়ে খুব একটা আস্থা রাখতেন না। সাধুবাবা বলেছিলেন, এখানে বাড়ী বানাস নে; ক্ষতি হবে। এটা শ্মশানের জায়গা। এছাড়া এখানে বোধহয় কবরও দেওয়া হয়েছে।

রায়বাহাদুর এসব কুসংস্কার একেবারেই মানেন না। বললেন, বাড়ী এখানেই হবে।

তা হোল বাড়ী। রাজপ্রাসাদ। আমি সে বাড়ীতে গেছি ২-৩ বার। মা'র সাথে। সবশেষে গেছি ১৯৭৩ এ।

রায়বাহাদুরের কিন্তু ক্ষতি হোল। হয়ত উনি ভাবতেই পারেন নি। ওনার পুত্র সন্তান জন্মালো এক এক করে। কেউ বাঁচলো না। কেউ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে, কেউবা এক বছর, দুবছরের মধ্যে। শেষ পুত্রের বিশ বছরের মাথায় বিবাহ দিয়ে দেন এক পরমাসুন্দরী কন্যার সঙ্গে। তার গর্ভে সন্তান আসে। রায়বাহাদুরের এই পুত্রসন্তান নিজের কন্যাকে দেখে যেতে পারেন না। তার আগেই মারা যান। posthumous child কে মানুষ করেন মা'র মামীমা।

আমি ওনাকে দেখি ১৯৭৩ এ। তখনও উনি খুব সুন্দর। উনি আমার মা'র সমবয়স্ক ছিলেন। দুজনের খুব বন্ধুত্ব ছিল।

রায়বাহাদুর তাঁর কন্যার (আমার দিদিমার) সাথে বিবাহের জন্য রাজপুত্রের ম'ত জামাই যোগাড় করলেন । আমার দিদিমা আদৌ সুন্দর ছিলেন না । রায়বাহাদুর সাথে উপহার দিলেন পাশের জমিটি। মেয়ে যাতে পাশেই থাকে।

আমার দাদু পরে বিশাল বাড়ী তৈরী করেন। বেশ মনে আছে সে বাড়ীতে বিরাট বড় বড় আমগাছ ছিল। গরমের ছুটীতে গেলে দাদুর সাথে বাঁশের লগা দিয়ে আম পাড়ার দৃশ্যটি এখনো চোখে ভাসে।

DO NOT COPY

দাদু বেশ লোক ছিলেন। দিদিভাই ভীষন strict ছিলেন। আমরা ওনাকে খুব একটা পছন্দ ক'রতাম না।

অলমিতি ।

নাগপুর
॥ এপ্রিল, ২০২৩ ॥

DO NOT COPY

নবম (৯)
প্রসঙ্গ: দেশ ছেড়ে বিদেশে

সুহৃদয়া,

প্রথম বিদেশ গেস্‌লুম আফ্রিকাতে। কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে।

গল্প ব'লব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার। পেশার কথা বলার জায়গা এটা নয়।

সেটা ছিল ২০০৩ সাল। কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে ইউনাইটেড নেশনস এর সরকারী মিটিং। যাওয়ার আগে থেকেই আমার ভয়ংকর প্যালপিটিশনের প্রবলেম শুরু হোল। ওষুধ-বদ্যি করা হোল। কিন্তু আরাম অনেক পরে পেয়েছিলুম।

ওদের দেশে যাওয়ার সময় ইয়োলো ফিভারের ওষুধ নিতে হয়। বাধ্যতামূলক। সেটার সুবিধা তখন শুধু মুম্বই এ পাওয়া যেত।

সেসব তো হোল। এবারে প্রস্তুতি।

নাইরোবি গেসলুম নাগপুর থেকে মুম্বই এবং মুম্বই থেকে গন্তব্যস্থল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে রাত তিনটের সময় বিমানের পেটে প্রবেশ। দেখে অবাক হ'লুম যে অত রাতেও বিমানবন্দর দিনের আলোর মত উজ্জ্বল। লোকগুলো কি রাতে ঘুমোয় না, নাকি নিশাচর!

বিমানে উঠে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। এত বড় পাখী হয় নাকি! এটা উড়বে তো ঠিকমত!

তখন প্রত্যেক সিটের পেছনে টিভি স্ক্রীন ছিল না। বিরাট এক পর্দা ছিল। তাতে সারাক্ষন সিনেমা। রাতে ঘুমের অসুবিধেও হয়েছিল।

বিমান উড়ল, তারপর সে যে কোনদিকে গেল কিছুই টের পেলাম না। তিনি আকাশচারী হয়েই থাকলেন, সাথে আমিও।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম; বিমানসেবিকার মধুর আওয়াজে নিদ্রাভঙ্গ হোল, গুড মর্নিং। বাইরে তাকিয়ে দেখি সকাল হয়েছে। বিরাট বড় ভ্যালীর উপর দিয়ে বিমানকে উড়িয়ে-উড়িয়ে, খেলিয়ে-খেলিয়ে পাইলট বাবাজীবন পাখীকে বিমানবন্দরে নিয়ে এলেন। আমি বিদেশের মাটীতে প্রথম পা রাখলাম।

সেখান থেকে আমি গেলুম এক ফাইভ স্টার ভিলাতে। সফরি হোটেল। তার মালিক ছিল এক কোরিয়ার অধিবাসী। সে এক সুবিশাল হোটেল।

পেশাগত বিষয়টা লিখছি না। খাবার-দাবার বেশ হোত। একবার তো এমন এক হোটেলে গেলুম, যেখানে কুমিরের মাংস কেটে কেটে দিচ্ছিল। সে যে কী ভয়ংকর দৃশ্য কল্পনার বাইরে। আর সবচেয়ে বড় কথা আমার বিদেশী বন্ধুরা সেগুলো গোগ্রাসে খেলো, সাথে যথেচ্ছ পরিমানে পানীয়।

মনে আছে তোমাকে একটা ফোন করতে গিয়ে প্রথম দিন প্রায় বিশ ডলার খরচ হয়ে গেছিল। পরে তাই ই-মেলে যোগাযোগ ক'রতাম।

নাইরোবির এক মল এ গিয়ে দেখলুম ওদের নিজের কোনো প্রোডাক্ট নেই। সবই বিদেশে তৈরী। ওরা এখনো বিদেশীদের খপ্পরেই আছে।

DO NOT COPY

শহরে চোর-ডাকাতের দৌরাত্ম বেশী। ফলতঃ সিকিউরিটি কাজ-কর্মের রমরমা ব্যবসা। নিয়ম-কানুন ভাল নয়।

প্রায় দিন-সাতেক ছিলাম। বিদেশের প্রথম অভিজ্ঞতা সুখকর ছিল না। অবশ্য পেশাগত বিষয়ে আমার কাজ প্রশংসা কুড়েয়েছিল।

অলমিতি
নাগপুর
(১৯।১১।২০২৩ ; ৭।৯।২৪)

DO NOT COPY

দশম (১০)
প্রসঙ্গ: ধর্ম তিষ্ঠতি কেবলম্

হে সুনন্দা,

আমার senior এবং former বিভাগীয় প্রধান ডঃ এস. বি. দেশপান্ডে সাহেব মারা গেছেন গতকাল। বার্ধক্যজনিত কারনে ভুগছিলেন। রেখে গেছেন ওনার কন্যা এবং পুত্রদের।

আজ সকাল এগারটার সময় funeral ছিল। গেস্‌লুম।

আগের দিন খবরটা পেয়েছিলুম। তখনই ঠিক করি শেষযাত্রায় যাব। আমি বহুদিন funeral attend করিনি। বরং বলা যায় avoid করেছি।

আসলে জানো আমি না ভীষন নরম। লোকের দুঃখ, রক্তপাত, মৃত্যু এসব সহ্য করতে পারি নে। একেবারেই নয়।

আজ রবিবার। বাজার করার দিন। সেসব কিনে বাড়ীতে রেখে তারপর গেছি শ্মশানে।

গাড়ীতে যেতে যেতে বড় অদ্‌ভুত একটা মানসিক অবস্থায় ছিলাম। ভাবছিলাম বেঁচে থাকার জন্য সমস্ত সুখ-সুবিধা, আহার, নিদ্রা সব কিছুর প্রয়োজন। বাড়ীর সব কাজ কর্ম করে তারপর আমি চলেছি। চলেছি কোথায় ? না. শ্মশানে। এক সৎকার অনুষ্ঠানে। মৃতের সৎকার প্রয়োজন, কিন্তু জীবনের দাবি যেন তার থেকেও বেশী।

তাই কী ? তাই নয় ?

গাড়ী চালাতে চালাতে আমার প্রিয় কাজ গান শোনা, রবীঠাকুরের গান। গান চালাতেই ভেসে এল আওয়াজ

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে ॥
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে ॥
তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে।
নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ--
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে ॥

রবিঠাকুরের আশ্রয়ে খুব শান্তি পেলাম। মন যদিও ভারাক্রান্ত ছিল। সমস্ত function attend কোরলাম।

মৃতের শরীরের ভারও নিলাম। নিজের কাঁধে। নিজের মা, বাবার জন্য পারিনি। Sir এর জন্য করতে পারলাম। আমার সৌভাগ্য।

DO NOT COPY

ওঁম শান্তি।

অলমিতি ।

নাগপুর
॥ ৩।১২।২৩ ॥

DO NOT COPY

একাদশম (১১)
প্রসঙ্গ: যার সাজে সে....

দেবী,

কথায় বলে 'যার সাজে সে পিদিম জ্বেলে.....'। সত্যি কথা । সবাইকে সব কিছু মানায় না । নিজের ক্ষমতার পরিচয় দেওয়ার অনেক উদাহরন নিশ্চয়ই আছে । শক্তির দম্ভ রাজা – মহারাজা, এবং বিভিন্ন দেশের পদস্থ কর্মচারীরা হয়ত দেখিয়েছে । আজও দেখাচ্ছে ।

আমি সেসব কথা বলছি না । আমি ব্যাক্তিগত পেশা এবং তার পরিচয় কিভাবে দেওয়া যায় তার কথা বলছি । দম্ভও প্রকাশ পেল অথচ, তার অহংকার লুকিয়েও রাখা গেল । অহংকার বোঝা গেলেই বা কি ? কাউকে অপমান না করেও অনেক কিছু বোঝানো যায় । সম্ভব ? হ্যাঁ, সম্ভব ।

শুনেছি একজন মহান সাহিত্যিক বলেছিলেন ' আমার যখনই কোনো ভালো গল্প পড়তে ইচ্ছে করে , আমি কাগজ পেন্সিল নিয়ে নিজেই গল্প লিখতে বসি ।

খুব বড় কথা । বলাও হোল, যে বোঝার সে বুঝল । নিজেকে তুলেও ধরা গেল লোকসমক্ষে ।

একটা ঘটনা মনে পড়ছে । পাবলো পিকাসো তার বন্ধুদের নিয়ে কোনো চিত্র প্রদর্শনী দেখতে গেসলেন । ফেরার পথে বন্ধুদের বৈকালিক চায়ে নিমন্ত্রন করলেন ।

বাইরের ঘরে ওদের বসিয়ে ভিতরে চায়ের কথা বলতে যান । বন্ধুরা ঘরের দেওয়ালে লাগানো প্রচুর ছবি দেখতে থাকেন ঘুরে ঘরে ।

কিছুক্ষন পরে পিকাসো যখন বাইরের ঘরে আসেন, বন্ধুরা খুব প্রশংসা করেন ছবিগুলোর । পরে একবন্ধু জিজ্ঞেস করেই ফেলেন " ছবিগুলো ভালো, কিন্তু I don't find any Picasso there!"

পিকাসোর সপাট জবাব, " I can't afford" ।

কি বুঝলে সখী ?

অলমিতি ।

নাগপুর
॥ ১৫ । ৫ । ২৪ ॥

দ্বাদশম (১২)
প্রসঙ্গ: কি বলি, কি না বলি

প্রিয়ে,

এবারের প্রসঙ্গ বড়ই বিড়ম্বনামূলক । "সদা সত্য কথা বলিবে" ছেলেবেলা থেকে এটাই শেখানো হয়েছে । মা, বাবা, গুরুজনেরা, school এর শিক্ষক-শিক্ষিকারা এটাই শিখিয়েছেন সবাই । সবসময় সত্য কথাটায় বলতে হবে । মিথ্যা কদাপি নয় ।

অন্যদিকে, আরো একটা কথা আছে । লোকে বলে, সত্য অপ্রিয় হলে বলবে না । অর্থ্যাৎ কিনা, " মা বদেত্ সত্যমঅপ্রিয়ম্" ।

মুশ্কিলটা এখানেই । অপ্রিয় সত্য না বললে সত্য গোপন করা হবে । অর্থ্যাৎ সত্যগোপন তথা মিথ্যাভাষন ।

সবসময় সত্য কথা বলবে অথচ সত্য অপ্রিয় হলে গোপন রাখবে, এ'দুটো পরস্পরবিরুদ্ধ হয়ে গেল না ? কী বিড়ম্বনা, তাই না ? যেসব মানুষ সত্যবাদী, নিজেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেন তাদের কর্তব্য কি ?

স্কুলে হেডমাষ্টারমশায়কে প্রশ্নটা করেছিলাম । তখন ক্লাস VIII এ পড়ি । ১৯৬৮ সাল হবে । বাংলা ব্যাকরনের বাগধারার ক্লাস । পন্ডিত মাষ্টারমশায়ের অনুপস্থিতে হেডমাষ্টারমশায় ক্লাসে এসেছেন ।

আমার প্রশ্নের উত্তরে একটা গল্প বলেছিলেন । আজো স্পষ্ট মনে আছে ।

দেশ সবে স্বাধীন হয়েছে । কলকাতার রাস্তা । সময় দ্বিপ্রহর । হন্হন্ করে চলেছেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী । কোনো কাজে । কারো কাছে যেতে হবে । তাড়া আছে ।

হঠাৎ দূর থেকে দেখলেন একদঙ্গল ছেলে জটলা করছে । প্যান্ট-শার্ট পরা । যুবক । ধরন ধারন ঠিক নয় । শ্যামাপ্রসাদ দুঃখ পেলেন । অনেক ছেলেই আবার সিগারেট খাচ্ছে । ভীষন রেগে গেলেন শ্যামাপ্রসাদ । ছিঃ ছিঃ । অধঃপাতে যেতে বসেছে দেশটা । এদের জন্যই এত কষ্ট করে দেশ স্বাধীন করা হোল ! ব্যথিত হলেন । ক্রোধও হোল ।

কিছুদূর যাওয়ার পরে হঠাৎই মুখোমুখী । দু'একজন যুবক এগিয়ে এল । এই যে শুনুন । দাঁড়ালেন । একজন জিজ্ঞেস করল, অমুক সিনেমা হলটা কোথায় জানেন ।

ছিঃ ছিঃ । একে এই পোষাক; সিগারেট জ্বলছে মুখে । এখন সিনেমা দেখবে । উচ্ছন্নের একশেষ । এরা দেশের ভবিষ্যৎ ? লজ্জ্বার কথা ।

ভীষন রেগে গেলেন । বললেন, আমি জানি না । বলেই স্থান ত্যাগ করলেন ।

DO NOT COPY

যেতে যেতে শ্যামাপ্রসাদ ভাবছেন । এ আমি কি করলাম ! সিনেমা হল কোথায় সে তো আমি জানি । জেনেশুনে মিথ্যে কথা বললাম ।

পরক্ষনে মনে হোল, ঠিক করেছি , বেশ করেছি । সত্য অপ্রিয় হলে না বলায় শ্রেয় । সিনেমা দেখলে ওরা গোল্লায় যাবে । ভুল করিনি আমি ।

এই দুই সত্য-অসত্যের দ্বন্দের মাঝে বেশ কিছুক্ষন যুঝলেন শ্যামাপ্রসাদ । শেষে মনে হোল, না, এর একটা বিহিত করতে হবে ।

ফিরলেন । অনেকটা পিছিয়ে এসে দেখেন, ছেলেগুলো তখনো সিনেমা হল খুঁজছে ।

ইশারায় ডাকলেন । শোন, সিনেমা হল কোথায় , আমি জানি । বলব না তোমাদের ।

ফিরে চলেন । চলা শুরু হোল । গন্ত্যব্যের দিকে । নিজের বিবেকের কাছে এবার পরিস্কার শ্যামাপ্রসাদ ।

অলমিতি ।

নাগপুর
॥ ১৫ । ৬ । ২৪ ॥
সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা

DO NOT COPY

ত্রয়োদশম (১৩)
প্রসঙ্গ: বীর সাওয়ারকর

প্রিয়ে,

তোমাকে অনেক ধন্যবাদ । আসলে বীর সাওয়ারকরের নাম জানা ছিল । সত্যি কথা বলতে কি ওনার সম্পর্কে কিছুই জানতাম না । আমার অজ্ঞতা ।

তোমার জন্যই সিনেমাটা দেখা হোলো । আমার চোখ খুলে গেল ।

এত বড় বীর ! এত বুদ্ধি, এত প্রতিভা; কী লেখনী শক্তি । কী বাগ্মীতা । ঐ সময়ের মহারাষ্ট্রের গ্রামে বসে বিপ্লবের কথা চিন্তা করাটায় অচিন্তনীয় । ব্রিটিশদের দেশছাড়া করার তীব্র ইচ্ছা । প্রচন্ড জাতীয়তাবোধ । কী সাংগঠনিক শক্তি ! আমি নতমস্তক ।

ওনার কাছে সুভাষ, মোহনদাসও যেন কিছুই নয় । তাই না ?

সারাটা জীবন শুধু জেলেই কাটালেন । কী অত্যাচার সহ্য করেছেন । বর্ননার অতীত ।

আমি নতুন করে ভাবতে শুরু কোরলাম । এ ছবিটা প্রত্যেক স্কুলে দেখানো উচিত । বীর সাওয়ারকরের জন্য আলাদা chapter হওয়া উচিত ইতিহাস বইয়ে ।

আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস নতুন করে লেখা উচিত । যাতে আমাদের নতুন প্রজন্ম জানতে পারে দেশের স্বাধীনতাতে কাদের contribution ছিল । আর কারা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে কতৃত্ব করছে ।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সাওয়ারকর প্রায় বিশ বছর বেঁচেছিলেন ।

ওনাকে পুরোপুরি ভুলে গেল কি করে, আমাদের দেশ ?

প্রচন্ড লজ্জার কথা । প্রচন্ড আক্ষেপের কথা ।

আবার ধন্যবাদ, সিনেমাটা দেখানোর জন্য ।

শ্রদ্ধায় মাথা নত করি এই বীর ভারতরত্নের জন্য ।

অলমিতি ।

নাগপুর
॥ ২১ । ৫ । ২৪ ॥
সকাল সোওয়া আটটা

DO NOT COPY

চতুর্দশম (১৪)

প্রসঙ্গ: জীবনটা পদ্যও তো হ'তে পারে

প্রিয়ে,

সেদিন ভাবছিলাম জীবনের সব কিছু গদ্যে লিখতে হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে ? দেয়নি । পদ্যও হতে পারে । পারেই তো ।

সমস্যা হোল, সঠিক ছন্দ মেলে না । সবাই মেলাতে পারে না । অবশ্য কবিগুরু গদ্য কবিতা লিখেছেন । আমার সেগুলো recite কোরতে বেশ লাগে ।

ভাবছি তোমাকে একটা কবিতা উপহার দেব । তুমি বলবে তুমি একটা পাগল, অথবা নিজেই হয়ত কবিতা ক'রে বলে ব'সলে,

বুঝে দেখ পাগলের কলমের জোড় ।
আকাশটা ছিঁড়েফুঁড়ে করে তোড়ফোড় ॥
থোড়বড়ি খাঁড়া, লিখে সারা সারা ।
এইবার লিখেছে খাড়া বড়ি থোড় ॥

আমি ব'লব হোল না । এটা সত্যজিতের লিমেরিক । তুমি বলবে তাতে কি? সারাক্ষন তো নিজেকে বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী বল, লেখ না বিজ্ঞানীকে নিয়ে একটা কবিতা ।

খুব ভেবে ভেবে শেষমেষ মনে হোল, আচ্ছা, রবিঠাকুরের সাধারন মেয়ের আদলে একজন most ordinary scientist এর কথা পদ্যে লেখা যায় না? অতি সাধারন বিজ্ঞানী ? চেষ্টা ক'রতে দোষ কি ?

দেখ তো পারি কিনা?

। অতি সাধারন বিজ্ঞানী ॥

আমি সাধারন, অতি সাধারন,
ভীড়ের মাঝে হারিয়ে যাওয়া,
অতি আকিঞ্চন, জনারণ্যের অতি নগণ্য একজন ।
তোমরা চেনও না, জানোও না,
নিজেই নিজেকে নিজের মধ্যে
অতি সংগোপনে লুকিয়ে রাখি ।
কাউকে কিছু বলি না,
প্রতিবাদ করি না
ব'লে কি হবে? পাগল বলে হাসবে,
ব্যঙ্গ ক'রবে ।
নই মানী, জ্ঞানী, গুনী,
আমি একজন অতি সাধারন বিজ্ঞানী।

DO NOT COPY

পায়ে পড়ি তোমার ঠাকুরমশায়,
এক বিজ্ঞানীর গল্প লেখ তুমি ।
অতি সাধারন বিজ্ঞানী ।
(সে) খুব পড়তে জানে, লিখতে জানে,
বলতে জানে তার সলজ্জ্ব সহজতায় ।
নিজেকে জাহির ক'রতে জানে না,
জানে না মিথ্যে বলতে,
(জানে) কাজ ক'রতে এবং করাতে,
পারে না অন্যের কৃতিত্ব নিজের ক'রে নিতে ।

তার নাম দিও অবিনাশ,
(সে) করুক অর্জন দেশের ও দশের বিশ্বাস,
এগিয়ে নিয়ে যাক বিজ্ঞানের রথ,
বর্ষিত হোক কবিগুরুর আশীর্বাদ ।

ভয় পেও না, অবিনাশ অনেক আছে,
ভারতে ও বিদেশে ।
তুমি তো কোনো ব্যক্তিবিশেষের গল্প লিখবে না ।
লিখবে সত্য কথা, লিখবে বিজ্ঞানের প্রগতির কথা,
বিশেষ জ্ঞানের কথা,
অবিরাম ব্যর্থতার এবং কচিৎ-কদাচিত সফলতার কথাও
ঝরে পড়ুক তোমার সোনার কলমে ।

সফলতার কারন, ব্যর্থতার বেদনা,
ন্যায়-অন্যায়ের সংঘাত, এবং
পক্ষপাতিত্বের নির্লজ্জ্ব প্রকাশের কথা ।
তাদের কথাও লিখ তুমি,
যারা বিকাশ তথা প্রগতির ধ্বজার আড়ালে,
আত্মভরিতা এবং দেশোদ্রোহিতার কথা বলে ।
তোমার কলমের সুতীব্র এবং সুতীক্ষ্ণ বানে
বিজ্ঞানভিক্ষুদের স্বপ্ন তথা আশাভঙ্গকারী
অসুরদের কথাও স্থান পাক।
তুমি তোমার ছত্রে ছত্রে ,
সত্যের অপলাপকারীদের প্রাসাদভিত্তি
ধ্বংস ক'রে দিও,
বিজ্ঞানের জয়পতাকা উত্তোলন করে ।

কিন্তু ঐখানে থেমে গেলে,
তোমার বিশ্বকবি নামে কলঙ্ক থেকে যাবে ।
কৃপনতার কলুষ যেন স্পর্শ না করে তোমার
সোনার লেখনীকে ।

DO NOT COPY

সবাইকে আহ্বানের গল্প লেখ তুমি ।
নবীন-প্রবীনের গোলযোগে না গিয়ে
প্রবীনের অভিজ্ঞতার চোখে
নবীনকে দেখার কাহিনী
হ'য়ে উঠুক মনোমুগ্ধকর, শ্রুতিসুখকর ।

ওরা কিন্তু নিয়ে যাবে দেশকে
তথা নতুন পৃথিবীকে চিরনতুনের পথে ।
অবিনাশ পুরস্কারের প্রলোভন জয় করেছে,
সে চেষ্টা ফলবতী হবে না ।
ইউরোপীয় রসজ্ঞের পক্ষপাতিত্বে
তাকে মাপতে যাওয়াও বৃথা ।
তুমি তো বিধাতাপুরুষ, সর্বজ্ঞ,
তুমি তোমার চোখে
বিজ্ঞানকে দেখ, বিজ্ঞানীর প্রতিভাকে মাপ,
এবং বিজ্ঞানের পথে
অন্তরায়, অশালীন তত্ত্বকে
তোমার কলম যেন প্রতিবাদের আঘাতে
চূর্ন-বিচূর্ন করে ।

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বিজ্ঞানীর মালা প্রস্তুত কোর তুমি,
দেখ, মালার প্রতিটি পুস্প যেন সজীব হয়, সুন্দর হয়
তাদের সুগন্ধ যেন সমগ্র বিশ্বকে সমৃদ্ধ করে,
পৃথিবী যেন নতুন ক'রে চিনতে পারে তাদের,
প্রয়োজনে,
পুস্পচয়ন সমিতির পুনরায় গঠনের কথা
সোচ্চারিত হউক তোমার লেখনীতে,
যাতে প্রতিটি পুস্পরূপী বিজ্ঞানী তাদের মেধা, প্রতিভা
এবং নিজ নিজ বুদ্ধির বলে তোমার প্রস্তুত মালাতে
নিজেদের স্থান করে নিতে পারে।

সময় দ্রুত বয়ে যায়,
তোমার আবির্ভাবের ক্ষন এসেছে,
হে মহামানব, বিশ্বকবি ,
এসো, প্রকটিত কর তোমার অস্তিত্বকে,
প্রজ্জ্বলিত কর চিরসত্যকে,
সত্যের মহিমাকে,
মিথ্যাকে পরাস্ত করে
তোমার কলম লিখুক এক বিজ্ঞানীর কথা
এক সাধারন বিজ্ঞানীর কথা ।

DO NOT COPY

আর তারপরে?
তারপরে হবে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা,
বিজ্ঞানীর মেধার স্বীকৃতি
তোমার কলমে ফুটে উঠবে
উজ্জ্বল সূর্যের,
উজ্জ্বল প্রভাতে,
অরুনোদয়ের কাহিনী ।
সেই হবে কবিগুরুর পুনঃ আবির্ভাব,
সাধারন বিজ্ঞানী ধরা দেবে
অসাধারন রূপে ।

এ কবিতাতে বিশ্বকবির বদলে যদি তোমাকে এই অনুরোধ করা যায়? রাখবে সে কথা ?

ভেবে দেখ !

অলমিতি

নাগপুর

(২৪।৫।২৪; ৪।৮।২৪)

DO NOT COPY

পঞ্চদশম (১৫)
প্রসঙ্গ: শিক্ষাদান

প্রিয়ে,

অযোধ্যায় এক রাজা ছিলেন,
দশরথ তার নাম ।
তিনটি রানীর চারটি ছেলে,
বড়টির নাম রাম ॥
রামের গুনে জগৎ আলো,
ভোলে চরাচর ।
রামের গুনে বন্দী হোল,
জগতের বানর ॥

মা সুর ক'রে বলতেন ছেলেবেলায় । মায়ের এই ছোট্ট কবিতার মাধ্যমেই রামায়নের প্রথম পাঠ শিশুকালেই সম্পন্ন হয়ে গেসল ।

সেদিন তোমার সঙ্গে এ প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল । ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান অনেক কিছুই আগেকার দিনে মা, বাবা, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক-শিক্ষিকারা সহজ ক'রে পদ্যে বা সুর ক'রে গেয়ে শিখিয়ে দিতেন ।

এর দুটো ফল হোত । একটি তাৎক্ষণিক । পরীক্ষায় প্রশ্নোত্তরের সুবিধা । দ্বিতীয়টি, বিষয়টি আজীবন ম'নে ধ'রে রাখার ক্ষমতা ।

এই দেখ না, মা'র কথা উপরে লিখলাম । সেই কবে শেখা ।

বড় হয়ে, বেশ ম'নে পড়ে ইউনিভার্সিটিতে একজন প্রোফেসর, বোটানি ক্লাসে cruciferae family পড়াতে পড়াতে খুব সুন্দর একটা জিনিষ শিখিয়েছিলেন । পদ্য ক'রে উনি বলেছিলেন এই লাইনগুলি । ১৯৭৩ এর কথা ।

Cruciferae শুধুই তেলে ভরা,
দুইয়ে দুইয়ে চারটি sepal,
চারটি petal, cross এ ধরা,
Cruciferae শুধুই তেলে ভরা,
Brassica র species যত,
তেল দেয়কো নানান মত,
শুধু খায় কপির বেলায়
ফুল কি তাজা, সবুজ পাতা,
Cruciferae শুধুই তেলে ভরা ।

DO NOT COPY

দেখ, সেই কবে বোটানি (pure) পড়া ছেড়েছি । কিন্তু আজও Cruciferae family সম্পর্কে লিখতে বললে at least কিছু তো লিখতে বা ব'লতে পারব । সেটাই আসল কথা ।

কবিতা বা পদ্যের মাধ্যমে কঠিন জিনিষকে সহজ ক'রে শেখানোর এ এক সুন্দর উদাহরন ।

কথা হচ্ছিল তোমাতে-আমাতে পৃথিবীর বৃহৎ নদ-নদীর নাম নিয়ে । তুমি হঠাৎ বললে তোমার কাকা তোমাকে সুর করে এই সুন্দর লাইনগুলো বলেছিলেন । কী চমৎকার বল ?

চারটি নদীর গল্প শোন,
দেখছে পৃথিবীর লক্ষ নয়ন ।
ভারতের গঙ্গা, চীনের ইয়াংসি.
মিসিসিপি ভিয়েতনামের মেকং ॥

দেখ, তোমার কথা দিয়ে এবারের প্রসঙ্গ শেষ ক'রলুম ।
গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজো ।

অলমিতি
নাগপুর
(৫।৮।২৪)

DO NOT COPY

ষষ্ঠদশম (১৬)
প্রসঙ্গ: লক্ষী এল ঘরে

হাই,

ঝুমির জন্ম হয়েছে হাওড়াতে । শীতকালে । আমরা তখন জোড়হাটে থাকতাম । শ্বশুরমশায়ের কথায় তোমাকে হাওড়াতে রেখে এসেছিলুম । আমাদের ইচ্ছে ছিল না । কিন্তু ওনারা বললেন অয়নের সময় ওঁরা কর্তব্য ক'রতে পারেন নি, কাজে কাজেই ।

প্রথম পাঁচমাস তুমি জোড়হাটেই ছিলে । আমার কাছে , সঙ্গী ছিল অয়ন ।

সে এক অদ্ভুত phase গেছে আমার । রান্না করা etc.., অফিস করা, সরকারী কাজে বাইরে যাওয়া, ইত্যাদী । বেশ মনে পড়ে ঐ সময় আমি map release function এ অরুনাচল প্রদেশে গেসলুম ।

খুব ঠান্ডা তখন জোড়হাটে । সাথে মানানসই load shedding । এবং বৃষ্টি । সোনায় সোহাগা ! জোড়হাটের ঠান্ডা ছিল ভিজে ঠান্ডা । তখন আমরা বোরাদার club road এর বাড়ীতে ভাড়া থাকতাম । ভালো বাড়ী ছিল । পাশে সমর ভাড়া থাকত । আমার কলিগ । সাথে ওর স্ত্রী জয়তী ।

তখন mobile এর যুগ শুরু হয়নি । চিঠিপত্রে যোগাযোগ হোত । তোমাকে সেই সময় কটা চিঠি লিখেছি মনে নেই ।

আমার December এ date adjust ক'রে টিকিট reservation করা ছিল । সেই সময় জোড়হাটে বসে ট্রেনের টিকিট book করা যে কী দুঃসহ ছিল , বাপ রে বাপ । Online এর জমানা তখন ছিল না ।

December মাসেই একদিন অফিসে Head সাহেব ওনার রুমে ডাকলেন । বললেন, অভিনন্দন । তোমার ঘরে লক্ষী এসেছে । তোমার শ্বশুরমশায় সকালে বাড়ীতে phone ক'রে খবর দিয়েছেন । জানলুম ঝুমি মা জন্মগ্রহন কোরেছে । ঝুমঝুমি নামটি তোমার ঠাম্মার দেওয়া । নবজাতিকা সবসময় আওয়াজ করে, ঝমঝম ক'রে বাজে, নামকরনের সার্থকতা মানতেই হবে ।

ঝুমি হওয়ার পরেই সাঁত্রাগাছি গেলুম । ট্রেনে । বেশ মনে পড়ে সারারাত travel ক'রেছি । সেই terrible কামরুপ এক্সপ্রেসে । হাওড়া থেকে রামরাজাতলা station এ নামলুম লোকাল ট্রেনে । একটা রিক্সা নিয়ে ডঃ গজাননের হাসপাতালের পাশ দিয়ে যাব শ্বশুরবাড়ী । হাসপাতালের গেটে রিক্সা দাঁড় করালাম । গেট বন্ধ । ডাকাডাকিতে collapsible gate এর ওপার থেকে একজন বলল, এখন হাসপাতাল বন্ধ, দেখা হবে না । আপনি কে ? নাম বললাম । এও বললাম, আমার স্ত্রী এখানে আছেন । ব'লতে ব'লতে তুমি আবির্ভুতা হলে । চাদর গায়ে । কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম ।

DO NOT COPY

ঢুকতে দিল না ওরা । কি অসভ্য । একটু রাগ হয়েছিল বৈকি । কিন্তু কি আর করার ছিল । নিয়ম তো মানতেই হবে ।

পরে আমরা সবাই এসে তোমার সাথে দেখা কোরলাম । ঝুমি মাকে তখনই প্রথম দেখলুম । আমার নিজের মা ১৯৯২ এ মারা গেছিলেন । ১৯৯৩ এ ঝুমি যেন আমাদের মা হয়ে ফিরে এল ।

ঝুমিকে নিয়ে হালিসহরে গেছিলাম । আমার বাবার সাথে দেখা করাতে । বাবা খুশী । উনি ঝুমির ভাল নাম রাখলেন, কবিতা ।

আমরা ঝুমিকে নিয়ে খুব শীঘ্রই জোড়হাটে চলে এসেছিলুম । ঝুমি প্লেনে এল । কী সৌভাগ্য ।

অলমিতি
নাগপুর
(৮।৮।২৪)

DO NOT COPY

সপ্তদশম (১৭)
প্রসঙ্গ: পাখীর কলকাকলি

Hello,

আমাদের নতুন প্রজন্ম দু'জায়গায় জন্ম নিল । একজন ভারতে, আর একজন বিদেশে, সুদুর আমেরিকায় । প্রথমটি দেশে আমাদের কন্যার কন্যাসন্তান । পরেরটি পুত্রের বাড়ীতে তার কন্যাসন্তান ।

ঝুমির সন্তানসম্ভাবনার কথা বাড়ীতে জানাজানি হ'তেই খুশীতে ভরে উঠল আমাদের বাড়ীর আবহাওয়া ।

ওরা প্রথমে ঠিক ক'রেছিল প্রসব Mumbai এ হবে । হঠাৎই মত পরিবর্তন হোল এবং নাগপুরে চলে এল ঝুমি ।

সে এক phase গেছে আমাদের । ঝুমি জন্মেছিল ১৯৯৩ । প্রায় ৩১ বছর পরে নতুন শিশুর আবির্ভাব হবে । উৎসাহ ছিল । ছিল উৎকন্ঠা । ঝুমিকে ছাড়তে প্রণয় এসেছিল; তারপর চলে গেল । অফিস থেকে প্রসবের সময় ছুটি নেবে । কাজেই ছুটি তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে । তাই না ?

আমরা প্রথমে এক lady ডাক্তারকে (Dr Ghodeswar) ঠিক ক'রেছিলাম । বাড়ীর একদম কাছেই । ভদ্রমহিলা মাস দু'য়েক পরে বেঁকে ব'সলেন । সিজারিয়ান হ'তে পারে । আমার এখানে সুবিধা কম । ধনতোলীর দিকে আমার এক sir আছেন, আমি সেখানে refer ক'রে দিচ্ছি ।

লোকমত square এ সাততলায় ডাক্তারের কাছে যাতায়াত শুরু হোল । প্রথমে প্রতি মাসে , পরে frequency বাড়ল ।

দিন এগিয়ে এল । জানুয়ারীর ১১ তে পাখী জন্ম গ্রহন ক'রল । ওরা বলে টিয়া, আমরা বলি পাখি । ভাল নাম তিয়াসা ।

শিশুর জন্মের পরে তার হোল জন্ডিস । তাকে ICU তে রাখতে হোল । সে আর এক phase গেছে । পাখি'মা সুস্থ হয়ে ফিরে এল বাড়ী ।

পাখি আমাদের কাছে মাসখানেক ছিল । ওরা যেমন হঠাৎই decision নিয়ে এসেছিল এখানে আসার , তেমনি হঠাৎই February তে চলে গেল ।

পাখীর সাত মাস বয়স হোল ।

সেই ঝুমি ! তার মেয়ে । ভাবা যায় !

Time flies । তাই না ?

অয়ন-মনুশ্রীর কথা আমরা জানলাম এ বছরের মাঝামাঝি । ওরা দু'জনে নিজেরাই সব ক'রেছে । ওখানকার ব্যবস্থা ভাল, তাই রক্ষে । তবে টানা-পোড়েন তো ছিলই ।

গতকাল মানে ৬ই সেপ্টেম্বর জন্মেছে পিহু । গণেষ চতুর্থীর পূর্ব সন্ধ্যায় এলেন ঘরের লক্ষী ।

DO NOT COPY

ভেবে দেখ আমাদের দুই প্রজন্ম পৃথিবীর দুই প্রান্তে জন্মগ্রহন কোরল । আমাদের উত্তরসূরীরা পৃথিবীর দুই মেরুতে বেড়ে উঠবে । আমরা থাকব না, ওরা আমাদের পতাকা নিয়ে জয়যাত্রায় অগ্রসর হবে ।

ভগবান ওদের মঙ্গল করুক ।

অলমিতি ।
নাগপুর
(১৮ । ৮ । ২৪)

DO NOT COPY

অষ্টদশম (১৮)
প্রসঙ্গ : বাড়ীর চার পুরুষ

প্রিয়ে,

আমার দিদিমা আমাদের পরিবারের চতুর্থ পুরুষ অর্থ্যাৎ fourth generation । দিদিমা বলতেই যে ছবিটা মনে আসে সেটা হোল, মাঝারী উচ্চতার কালো রঙ্গের একজন পঞ্চাশোর্ধের মুখ ব্যাজার করা মহিলা, পরনে তাঁর রঙ্গীন পাড়ের সাদা শাড়ী । দিদিমাকে আমরা দিদিভাই বলে ডাকতাম । কারন আমাদের দিদি (বড়দিদি) ঐ নামেই ডাকতেন ওনাকে ।

আমার স্মৃতিতে দিদিভাই এর সঙ্গ খুব একটা সুখের ছিল না । ভীষন strict, রাগী ছিলেন উনি । কথা কম বলতেন, কিন্তু যখন বলতেন সেটা হুকুমের মতন শোনাত । দিদিভাই কাছে থাকা মানেই ১৪৪ ধারা জারী ।

প্রথম যেটা মনে পড়ে তার যবনিকা উঠবে সিউরিতে, আমার মামাবাড়ীতে । ঠিকানা, মাতৃস্মৃতি, ডাঙ্গালপাড়া, সিউরি, জিলা বীরভূম । মামাবাড়ীতে মামাবাড়ীর আবদার আদৌ ছিল না ।

আমার দিদির প্রথম সন্তান হয়েছে তখন । আমার বই পড়ার সখ । ওদের ওখানে electric light । আমি তো হ্যারিকেনের মানুষ । যেই ঘরে এসে উনি আলো জ্বালাচ্ছেন, আমি সেখানে গিয়ে বই পড়তে শুরু করছি । আমাকে বই পড়তে দেখলেই উনি light off ক'রে দিতেন । কী বিরক্তিকর বল ? কোনো মানে হয় ? কি, না, বিজলী বিলের টাকা কম উঠবে ।

দিদিভাই খুব সুন্দর চিঠি লিখতেন । মা'কে লেখা পোষ্টকার্ড প্রায় আসত হালিসহরে । সম্বোধনে লিখতেন, ' সাবিত্রীসমানা মা রানু '। কী সুন্দর, না ?

উনি খুব বই প'ড়তেন । পড়াশুনোতে অপরিসীম আগ্রহ ছিল । সাতটা ছেলেমেয়ে । পাঁচটি মেয়েকে পাত্রস্থ করা । বিরাট দায়িত্ব । দাদু খুব একটা বড় কেউকেটা ছিলেন না । দিদিভাইকে তাই খুব হিসেব ক'রে সংসার চালাতে হ'ত ।

যাঁদের কথা লিখছি তোমায়, তাঁরা সবাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন । তার প্রকোপও ওঁদের উপর পড়েছিল । পঞ্চাশের মন্বন্তর ওঁরা খুব কাছ থেকে দেখেছেন । আমার মা'র মুখে শোনা সেসব । সে এক করুণ অভিজ্ঞতা ।

দিদিভাইকে খুব কাছ থেকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল ১৯৭৮-৭৯ তে । আমি দিল্লীর পুসার ছাত্র তখন । ১৯৭৮ এ দাদু মারা যাওয়ার পরে দিদিভাইকে ছোটোমামা দিল্লীর চিত্তরঞ্জন পার্কের বাড়ীতে নিয়ে আসেন । মামা প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন আমাকে । প্রতি রবিবারে । 'দিদিভাই এসেছেন, তুমি চলে এস । প্রথমদিকে পড়ার চাপ কম থাকায় যেতে পারতাম, পরে যাতায়াত ক'মে এসেছিল ।

সে যাই হোক, আমি গেলেই দিদিভাইকে আমার জিম্মায় রেখে মামা-মামী শপিং এ চলে যেতেন । কখনো বা অন্য কোথাও । দিদিভাই মামা-মামীর এ যত্রতত্র বিচরন ভালো চোখে দেখতেন না ।

একবার তো রেগেমেগে বললেন, তুই আমার ক'লকাতা ফেরার টিকিট ক'রে দে । মহা মুশ্‌কিলে প'ড়লাম । মামাকে কায়দা ক'রে ইনডাইরেক্টলী জানালাম । উনি ব্যাপারটা কোনওভাবে ঠেকিয়ে ছিলেন সেযাত্রায় ।

আসলে ছোটোমামাদের জীবনশৈলী অন্যরকম ছিল । দিদিভাই এর পক্ষে ঐ বয়সে সেসবের সাথে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হ'ত না । আশা করাও উচিত নয় । আমি দিদিভাই এর এই টানা-পোড়েনের নীরব সাক্ষী ছিলাম । পরে পড়াশুনোর চাপে মামাবাড়ী যাওয়া ক'মে গেসল ।

ভাই এর কাছ থেকে পরে শুনেছি দিদিভাই আমাদের হালিসহরের ভাড়াবাড়ীতে প্রায় এসেছেন এবং থেকেছেন । ওনার ওখানে ভাল লাগত ।

আসলে দীর্ঘদিনের জীবনসাথী দাদুকে হারানোর বেদনা ওনাকে হয়ত মানসিকভাবে অস্থির ক'রে তুলেছিল ।

তখন ছোট ছিলাম । বুঝতাম না । এখন বুঝতে পারি ।

দিদিভাই এর নিজস্ব জীবনশৈলী অতি সাধারন ছিল । উনি গম্ভীর থাকতেন । তুমি ওনাকে দেখেছ শিয়ালদহের ছোটোমাসীর কোয়ার্টারে ।

মনে পড়ে ?

অলমিতি
নাগপুর
(২৩।৮।২৪)

DO NOT COPY

নবদশম (১৯)
প্রসঙ্গ: জননী জন্মভূমিশ্চ.....

প্রিয়ভাষিনী,

মা শব্দটি অনেক সম্ভাষনের সাথে যোগ হয় । যেমন পিসিমা, মাসীমা, মামীমা, জেঠিমা ইত্যাদী ।

কিন্তু শুধু 'মা' শব্দের অন্য এক মাধুর্য আছে । তাই না ? মা বলতে অন্য ভাব প্রকাশ পায় । ছোট্ট শব্দ । ঐ শব্দেই সব জব্দ । সব্বায় । মা শব্দের মহিমা বিশাল । তার ব্যাপকতা সারা পৃথিবীতে । মা প্রত্যেকেরই প্রিয় ।

আমার মাও আমার খুব প্রিয় ।

মা ভীষন স্ট্রীক্ট ছিলেন । ছেলেবেলায় শাসনের সময় মা'র মুখের কথায় ছিল, 'খাওয়াব তপ্ত, হাগাব আম রক্ত' । অর্থ্যাৎ 'spare the rod and spoil the child' principle । তখনকার সময়ই ছিল তাই । মা প্রায়ই বলতেন, আমার পেছনেও দুটো চোখ আছে । কতদিন কতবার মাকে আড়াল থেকে লক্ষ করতাম, কোনদিনও মার পেছনের চোখদুটোর হদিস পাই নি । সত্যি বলছি, বিশ্বাস কর ।

বহুবার আমার অথবা অন্য ভাই-বোনেদের অসভ্যতার খবর মা টের পেয়ে যেতেন; সে বাড়ীর মধ্যেই হোক অথবা বাইরে । পরে মার শাসন শুরু হোত । শাস্তি মৌখিক অথবা শারীরিক, নির্ভর ক'রত অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী ।

অনেক পরে জেনেছিলাম ওনাকে পাড়া - পড়শীরাই খবর দিত । সমস্ত দিকে নজর ছিল মা'র । ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া, পোষাক- পরিচ্ছদ, সকলের আহার, উনুন ধরানো, কয়লা ভাঙ্গা, গুল দেওয়া এবং শুকোনো, ঘুঁটে গুছিয়ে রাখা, কেরোসিন হিসেব ক'রে খরচা করা, দোকান-বাজার, মেয়েদের বিশেষ শাসনে রাখা, সন্ধ্যের আগে চুল বাঁধা এবং বেঁধে দেওয়া, সূর্যাস্তের আগে হ্যারিকেন তৈরী রাখা, এবং আমাদের সন্ধ্যের আগেই হাত-পা ধুয়ে-মুছে পড়তে বসা । পড়তে হবে চীৎকার ক'রে, যাতে উনি রান্নাঘর থেকে আওয়াজ পান । ভুল পড়লে এসে শুধরেও দিতেন । ছেলেবেলায় সব একা হাতে ক'রতেন আমার মা ।

আমাদের যুগ ছিল হ্যারিকেনের । বিজলী বাতি অনেক পরে পেয়েছি আমরা । মা ছিলেন আজকের সি. ই. ও. । সমস্ত ম্যানেজমেন্ট নখদর্পনে ।

বাবার অফিসের সমস্যার সময় মা সংসার চালানোর জন্য এক সেলাই মেশিন কিনলেন । ইনষ্টলমেন্টে টাকা শোধ করা হবে । মৃত সৈনিকদের পোষাক কেটে-ছেঁটে শুরু হোল ব্যাগ তৈরী করা । কিছু তো আয় হবে ! প্রয়োজনে ছেলে-মেয়েদের প্রাইভেট পড়িয়েও রোজগার ক'রেছেন সংসার চালানোর জন্য ।

DO NOT COPY

মা নার্সিং এর ট্রেনিং নিয়েছিলেন। সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন। রোগীর সেবায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বাবার তিনবার টাইফয়েড হয়েছিল। যমে-মানুষে টানাপোড়েন চলেছিল। মা'র সেবায় বাবা সুস্থ হয়ে ওঠেন। আমার আর দিদির টাইফয়েডেও মা আমাদের মাথার কাছে সর্বদায় বসে থাকতেন।

উনি ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। অনেক অভ্যাস চেষ্টা করেও ছাড়তে পারেন নি। এমনিতে প্রগতিপন্থি ছিলেন। নতুন কিছু সহজেই গ্রহন করার শিক্ষা ছিল ওনার। নিত্য গুরুর পূজো ক'রতেন। দীক্ষা নিয়েছিলেন।

খুব ঘটা করে বাড়ীতে লক্ষীপূজোর আয়োজন হোত। ঠাকুরের ভোগটা নিজে রান্না ক'রতেন। পূজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত্য উপোস করে থাকতেন। অনেক সময় শরীর খারাপ হোত। বাবা রাগারাগি ক'রতেন।

লক্ষীপূজোয় পুরোহিতের সমস্যা তখনো ছিল, এখনো আছে। মার শরীর খারাপ হোত, উপবাসে, পরিশ্রমে, পুরোহিতের দেরীতে আসার চিন্তায়। মহা মুশ্কিল। শেষমেষ বাবা পুরোহিত হ'তে রাজী হ'লেন।

পাড়ার অনেকে আসত প্রসাদ নিতে। সে আমলে ব্রাহ্মনের বাড়ী ছাড়া লক্ষীপূজোতে কেউ অন্নভোগ রান্না করত না। মার রান্না করা ভোগপ্রসাদ লোকে তৃপ্তি করে খেত। সব ভাই-বোনেরা একসাথে কাজ ক'রতাম। সামর্থ্য কম ছিল, উৎসাহ দিয়ে সেটা ভরিয়ে দেওয়া হ'ত। আর্থিক অনটন কাটিয়ে একযোগে, একসাথে পূজোর আনন্দে সবাইকে মাতিয়ে দিতে পারতেন শোভারানী। আমার মা।

মা ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু মহিলা। আমাদের নিজেদের সামর্থ্য কম ছিল বটে কিন্তু তাও উনি সর্বদায়, যতটা সম্ভব, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। দেবদ্বিজে বিশেষ ভক্তি ছিল। মা'র হাত ধরে অনেকবার গুরুদেবের আশ্রমে গীতাপাঠ শুনতে গেছি। অতশত বুঝতাম না, পরিবেশটা ভালো লাগত। রাতে রামায়নের কথা শুনতেও পাড়ার ছোট ছোট অনুষ্ঠানে গেছি। মার সাথে।

সেই সময়ে বাড়ীতে খুব ভিখিরি আসত। একটা থালাতে একটু চাল, একটা আলু দিয়ে ওদের সাহায্য ক'রতেন মা। অনেকে পয়সা চাইত। পয়সা দুস্কর ছিল সে আমলে। দেওয়া যেত না।

পাড়ার ফেরীওয়ালারা আসত। সুর ক'রে ক'রে আওয়াজ দিত। শাড়ী-কাপড় বিক্রি ক'রত। মা অনেক সময় ডাকতেন, অনেকবার নাও বলতেন। বিক্রেতা নাছোড়বান্দা। মা দর-দাম করাতে পটু ছিলেন। প্রতিবেশীরা মা'র সাহায্য চাইতেন। মাও এগিয়ে আসতেন। হালিসহরে তখন কিছুই পাওয়া যেত না। নৈহাটী যেতে হোত। মাকে অনেকেই সঙ্গী করে নিয়ে যেত।

বাসনওয়ালারাও খুব আসত সেকালে। মা পুরোনো কাপড় দিয়ে নতুন বাসন কিনতেন। কিনে জিজ্ঞেস ক'রতেন, হ্যাঁ গো. এটা ভালো হবে তো ? সে বলত, হ্যাঁ। মা ব'লতেন, তা জানিনা বাবা, আমি তো ভালো জিনিষ

দিয়েছি। এখন দেখ, আমার ধর্ম আমি পালন করেছি, তুমি তোমারটা কর।

খুব সাধারন কথা, গভীর অর্থবহ। আমি আমার ছাত্রদের, সহযোগীদের বারবার মা'র এই কথার উল্লেখ করে থাকি।

অধিকাংশ বিক্রেতারা হিন্দীভাষী হোত। মা অনায়াসে হিন্দী-বাংলা মিশিয়ে বার্তালাপ ক'রতেন। কথাতে খুব পটু ছিলেন মা।

আজ অনেককিছু পাওয়ার পরেও কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। মার কথা মনে হলে আজো মন কেমন করে।

মা চলে গেছেন ১৯৯২ এ। তখন আমি জোড়হাটে। মাকে শেষ দেখেছি ১৯৯২ এর জানুয়ারীতে। জোড়হাটে যাওয়ার আগে দেখা করতে গেসলুম।

সেই শেষ দেখা।

অলমিতি
নাগপুর
(২৪।৮।২৪)

DO NOT COPY

বিংশতি (২০)
প্রসঙ্গ: পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম

হে নবীনা,

আমার বাবার নাম শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য । পুরোহিত বংশে জন্ম । জন্মতারিখের প্রসঙ্গ উঠলেই বলতেন, আমার বার্থ ডেট, ফোর ফোর এইটিন অর্থ্যাৎ ৪.৪.১৮ । শিবরাত্রির দিন জন্ম, তাই নাম রাখা হোল শিব ।

শ্রী শ্রীষ ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় পুত্র শিব জন্মালো প্রথম পুত্র তারাপদের জন্মের ২৭ বছর পরে । সে অর্থে আমার জেঠামশায় তারাপদ, আমার বাবার প্রায় পিতৃস্থানীয় । অথচ শুনলে অবাক হবে এই তারাপদবাবু কিন্তু পুত্রপ্রতীম ভাইকে সম্পত্তি থেকে সম্পূর্নরুপে বঞ্চিত করেছিলেন । বাবাকে আবেগপ্রবন ক'রে সাদা কাগজে সই নিয়ে নিয়েছিলেন । শুধু তাই না, দেশভাগের পরেও বাবাকে বিভিন্নভাবে এক্সপ্লয়েট করেছেন । ওনাকে সাহায্য ক'রতেন ওনার সহধর্মিনী মানে জেঠিমা । এসব কথা মা'র থেকে পরে শুনেছি ।

বাবার জন্মের তিন-চার বছর পরে আমার ঠাকুমা মারা যান । মা অনেকসময় রেগে গিয়ে বলতেন, জন্মেই তো মা'টাকে খেয়েছ । বাবা শুধু শুনতেন । মা'হারা ভাগ্নেকে পরে যশোহর থেকে বাবার মামা কাঁচড়াপাড়াতে নিয়ে আসেন ।

বাবার মামা ছিলেন প্রবল-প্রতাপান্বিত চিফ ইন্জিনিয়র । তাঁর বাংলোয় বাবার সাথে আরো তিন মাতৃহারা ভাইদের লালন-পালন শুরু হোল । দেখাশুনার ভার ছিল অবাঙ্গালী চাকর-বাকরদের হাতে । নামেই চাকর, আসলে তারা ছিল ছেলেদের অভিভাবক ।

বাবা কাঁচড়াপাড়ার হার্নেট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন । ভাল ইংরাজী জানতেন । ইংরাজী শব্দের বানান এবং উচ্চারন ছেলেবেলায় বাবার কাছেই শেখা ।

আগেই বলেছি আমরা পুরোহিত বংশের লোক । পৌরোহিত্য, যজন-যাজন, দীক্ষা এবং পুরান-শাস্ত্র শিক্ষায় ছিল আমাদের পেশা । যশোহরের ঝিনাইদহের বাড়ীতে নাকি টোল ছিল । সেখানে দূর-দূরান্ত থেকে শিষ্যরা বেদ-বেদান্ত উপনিষদের পাঠ শিখতে আসত । যেহেতু বাবা ছোটবেলা থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিলেন, কাজে কাজেই পিতৃপুরুষের পেশাতে আগ্রহ দেখান নি ।

প্রথমে রেলে, পরে পোষ্ট অফিসে চাকরী নেন বাবা। অধিকাংশ সময় ক'লকাতায় কাটিয়েছেন । ক'লকাতা শহরের অলি-গলি একসময়ে মা-বাবার মুখস্থ ছিল ।

শুনেছি মা-বাবা বিয়ের পরে যখন ক'লকাতায় ছিলেন এক-একদিন তিন-তিনটে শো'তে সিনেমা দেখেছেন, পাশাপাশি হলে। তখন নতুন বিয়ে হয়েছে ওঁদের। ভালো মাইনে ছিল। ছেলে-মেয়ে হয়নি, ঝাড়া হাত-পা।

পরে ভাগ্য অন্যদিকে ঘুরেছে। সাতটা ছেলে-মেয়েকে নিয়ে সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়েছেন।

আমি সে-সব দিনের সাক্ষী। দেখেছি, নিজের ছোট্ট ক্ষমতায় পরিবারকে সাহায্যও করেছি।

বাবা ভালো ব্যাডমিন্টন খেলতেন। খুব স্মার্টলি সাইকেল চালাতেন। আমাকে ডাবল ক্যারী ক'রে হালিসহর থেকে কাঁচড়াপাড়া নিয়ে গেছেন। বাবা মারা যান ১৯৯৪ এ। তখন আমি থাকি জোড়হাটে।

সে সব দিন যেন এক একটা দ্বীপের মতন। স্মৃতি-রোমন্থনের সাগর জলের ক্রমহ্রাসমান তলের থেকে মাঝে-মাঝে জেগে ওঠে। মনে হয়, যেন এই সেদিনের কথা।

মা-বাবার স্ট্রাগলের এর কথা মনে প'ড়লে মন যেন কেমন হয়ে যায়। মনে হয় আমি ওঁদের জন্য কিছুই করে উঠতে পারিনি।

চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে।

অলমিতি

নাগপুর
(২৪।৮।২৪)

DO NOT COPY

একবিংশতি (২১)
প্রসঙ্গ: গুরুদেব দয়া কর দীনজনে

দেবীজী,

এ এক অন্য প্রসঙ্গ ।

তখন থাকতাম দাদুর বাড়ী, মানে আমার মা'র কাকার বাড়ী । ছোট্ট অপরিসর অ্যাসবেষ্টসের ছাদের বাড়ী । দীনতার মাঝে থাকতাম আমরা । সেই দুঃখের কুরুক্ষেত্রে আমাদের সারথি ছিলেন, আশ্রমের দাদু, মা-বাবার গুরুদেব । মা-বাবা দীক্ষা নিয়েছিলেন ওনার কাছে । আমরা দাদু বলতাম ওনাকে ।

উনি আমার কাছে আজও ভগবান । সত্যি কথা । গৈরিক বসন, গৈরিক উত্তরীয়, শ্বশ্রুগুম্ফসমন্বিত গৈরিক সন্ন্যাসী । ত্যাগের এবং নিষ্ঠার প্রতিমূর্তি । আমি ১৯৬০-৭০ এর কথা ব'লছি ।

আমরা আশ্রমের পাশেই থাকতাম । মাঝে একটা বিরাট মাঠ ছিল । দুপুর বারোটায় পূজোর ঘন্টা বাজত । দাদু ওনার গুরুদেবকে পূজো ক'রতেন, সাথে ভোগপ্রসাদ দিতেন । আমাদের লোভ ছিল ঐ প্রসাদে । ঘন্টা বেজেছে, কি ছুট্ । হাতে ছোট কাপ বা বাটি নিয়ে দাদুর মন্দিরে ।

দাদু মন্দিরের ভিতরে দরজা বন্ধ করে পূজো ক'রতেন । একটু পরে বাইরে আসতেন । আমরা প্রনাম ক'রতাম ওনাকে । মন্দিরের চারিদিকে বারান্দা ছিল । দাদু প্রদক্ষিন ক'রতেন, নিঃশব্দে । আমরাও । খুব ছোট ছিলাম তখন ।

বেশ কিছুক্ষন পরে দাদু মন্দিরের বন্ধ দরজার সামনে তালি দিতেন । তারপরে ভিতরে যেতেন । একা ঢুকতেন ভিতরে । বেরিয়ে এসে হাতের থালা থেকে প্রসাদে দিতেন । তরকারী, একটু একটু । আলুনী । কোন নুন নেই । অমৃতসম স্বাদ । এখনো মুখে লেগে আছে প্রসাদের সুগন্ধ এবং তার অতুলনীয় স্বাদ ।

একবার রমাকে বলেছিলেন যে চট্টগ্রামে থাকাকালীন উনি নাকি খুব মোটা হয়ে যান । ওনার গুরু আদেশ দেন, নুন খাওয়া বন্ধ করে দে । সারাজীবন গুরুর আদেশ মেনেছেন ।

দাদুর বাগান ছিল । নারকোল হোত । একটা সফেদা গাছ ছিল । আমাদের দিতেন ।

আমার মা-বাবাকে নিজের সন্তানের মত দেখতেন । বাড়ীর কোন সমস্যা হলে মা ওনার কাছে পরামর্শের জন্য যেতেন ।

কখনো কোনো শিষ্যের কাছে কিছু চাইতেন না । নির্লোভী গৈরিক সন্ন্যাসী । প্রকৃত সন্ন্যাসী ।

আমার এক দিদির বিয়ের সময় উনি বাড়ীতে নিজে এসে মাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন । স্বয়ং আমাদের ভাড়া বাড়ীতে এসেছিলেন ।

DO NOT COPY

মা বলতেন উনি নাকি সর্বজ্ঞ ছিলেন। সব জানতেন, সব বুঝতেন।

বেশ মনে আছে ওনাকে প্রতিদিন পূজো করতাম। চিনি, জল-বাতাসা দিতাম। তুমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলে, দাদু আপনি পান ? হাসতে হাসতে বলেছিলেন, যাকে দাও, সেই পায়। মনে আছে তোমার ?

একবার মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। নাগপুরে। বিছানায় উঠে ব'সলাম। মনে হোল, দাদু আমায় কিছু ব'লছেন, তুই এগিয়ে যা, কেউ ঠেকাতে পারবে না তোকে।

পরদিন সকালে নানান কাজে ভুলে গেসলুম, কথাটা তোমাকে বলা হয় নি। সেদিন রাতে আবার এলেন দাদু স্বপ্নে। একই কথা আবার।

সারাদিনের অফিসের কাজে আবারো ভুলে গেলুম কথাটা বলতে তোমায়।

রাতে ফুলদির ফোন। জানিস, একটা দুঃখের খবর আছে। আমার স্বপ্নের কথা হঠাৎ মনে পড়ল। দিদিকে থামিয়ে বলে উঠলাম, হ্যাঁরে, আশ্রমের দাদু কি ..... ? দিদি অবাক, তুই কি ক'রে জানলি ? সব ব'ললাম দিদিকে। তুমি পাশে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে শুনছিলে। হ্যাঁ রে, দিদি ব'লল, আশ্রমের দাদু আর নেই। যাওয়ার সময় তোকে দেখা দিয়ে গেছেন।

আমি সেই স্বপ্নের দৃশ্য আজও দেখতে পাই চোখের সামনে। ওনাকে স্মরন করি। এমন পরোপকারী সন্ন্যাসীকে শুধু শ্রদ্ধায় নয়, ভীষন ভালোবাসি। আজও।

আমি জানি ওনার আশীর্বাদ আমাদের সকলের উপরে সর্বদায় থাকবে।

অলমিতি
নাগপুর
(২৫।৮।২৪)

DO NOT COPY

দ্বিবিংশতি (২২)
প্রসঙ্গ: ওঁম সাঁই

শুভশ্রী,

শির্ডির সাঁইবাবার নাম আমি ১৯৮৪ তে এসে প্রথম জানি । দর্শন ঐ বছরেই হয়েছে, পরে ।

নাগপুরে এসেই বাধ্যতামূলক সয়েল সার্ভের যাঁতাকলে পড়ে গেলুম । যেতে হোত পুনে এবং পরে গুজরাতে । জীপে ক'রে । যাত্রাপথ ঔরংগাবাদ এবং শির্ডি হয়ে ।

আমাদের নিয়ম ছিল সাঁইবাবার থানে ওনাকে পূজো দিয়ে সার্ভের কাজে যাওয়া এবং ফেরার পথে ওনাকে প্রনাম করে নাগপুরে ফিরে আসা ।

একবার এক মজার ঘটনা ঘ'টেছিল । সেটা বলার জন্যই এ চিঠির অবতারনা ।

তখন রাস্তাঘাট এত ভাল ছিল না । PWD র গেষ্ট হাউসগুলো ভীষন উদাসীন ছিল ঘরে থাকতে দেওয়ার বিষয়ে । বোলতো জিলা অধিকারীর চিঠি লাগবে ।

আমাদের থাকার কোন নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা থাকত না । কাজে কাজেই কোনো লিখিত অর্ডারও নেওয়া হয়ে উঠত না। সন্ধ্যে হতেই রাতের আস্তানা খুঁজতে শুরু ক'রতাম । পেতাম না । পিছনে যাওয়ার প্রশ্ন নেই । শুধু সামনে, চরৈবতি চরৈবতি চরৈবতি । আবার কিছুটা যাওয়া , আবার কয়েক মাইল ।

এই ক'রতে ক'রতে একবার বেশ রাত হয়ে গেল । সাথীরা ব'লল, সাঁইয়ের থানেই গেষ্ট হাউসে থাকা যেতে পারে ।

তখন গ্রীষ্মকাল। তীব্র দাবদাহ, সাথে প্রচন্ড জলকষ্ট। গেষ্ট হাউসে এসে অবাক হ'লাম ; হতাশ হ'লাম বেশী। পাঁচতলায় ঘর, লিফ্ট নেই । তোষকে ছারপোকা। বাথরুমে জল নেই। মন বিদ্রোহ করে উঠল। থাকব না এখানে ।

আবার পথ, আবার আস্তানার সন্ধান । বহুজায়গায় খুঁজে, শেষে এক নদীর পাশে ছোট্ট কুঁড়েঘরে ঠাঁই পেলুম । বিছানা ছিল, সেটা ভালো করে দেখার না ছিল শক্তি, না ইচ্ছা । জল ছিল, কম । দম নিয়ে, একটু জিরিয়ে বিছানায় বসে দেখি সামনে প্রকান্ড ছবি, সাঁইবাবার । হাসছেন ।

পরদিন সকালে পাশের নদীতে স্নান সেরে সাঁইবাবার পূজো দিয়ে আবার যাত্রা শুরু ।

জীপে বসে সহকারী হাসতে হাসতে বললেন, সাহেব, সাঁই এর দেওয়া আস্তানা কাল ছেড়ে দিলেন । সাঁই কিন্তু আপনাকে ছাড়েনি । সারারাত মন্দিরের চারপাশেই আমাদের ঘুরপাক খাইয়েছেন । শেষে যেখানে রাত

DO NOT COPY

কাটালাম, সেটাও খুব আহামরি কিছু ছিল না। সাঁইবাবা যা দেন সেটা গ্রহন ক'রতে হয়।

বিষয়টা ঠিক তোমাকে লিখে বোঝাতে পারলাম কিনা জানিনা, কিন্তু বিশ্বাস কর, সে রাতে কিন্তু অনেক পরে আমরা থাকার জায়গা পেয়েছিলাম। প্রায় রাত দুটো-তিনটে হবে। বাবা খুব ঘুরপাক খাইয়েছিলেন সে রাতে। সহকারী ঠিকই বলেছিল, সাঁইবাবা সেদিন আমাকে ছাড়েননি, আজও না।

আমি যখনকার কথা বলছি, তখন শির্ডির মন্দির খুব ছোট ছিল। এত ভীড়ও ছিল না। সহজেই বাবার মূর্তির কাছে যাওয়া যেত। পুরো মন্দির প্রাঙ্গন আমরা ঘুরে দেখতাম। সামনে একটা বাগান ছিল। সেখানে ছিল হরিন। বাচ্ছারা খেলতে আসত বাগানে।

সাঁই মন্দিরে সবাই আসত। সমস্ত ধর্মের লোকদের দেখেছি। তখন ভি.আই.পি. কালচার ছিল না। ভীড়ও ছিল না। অনেক শান্ত এবং শান্তির পরিবেশ ছিল। এখন সব বদলে গেছে।

সাঁইবাবার অনেক গল্প আছে। ওনার অনেক কৃপা এবং আশীর্ব্বাদ আমার উপর। উনি আমার বড় বন্ধু। আমার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ, জয়-পরাজয়, নৈরাশ্য-সাফল্য সব কিছু আমি শুধু ওনাকেই বলি।

ওঁম সাঁই।

অলমিতি
নাগপুর
(২৫।৮।২৪)

DO NOT COPY

ত্রয়োবিংশতি (২৩)
প্রসঙ্গ: আসামের গল্প

বঁধূ মোর,

এসব ১৯৯২ র কথা । আমার শাস্তিমূলক বদলীর চাকরিতে আসামের জোড়হাটে পৌঁছলাম জানুয়ারীর বর্ষনক্লান্ত শীতের অপরাহ্নে ।

জোড়হাট যাওয়ার কয়েক দিন পরেই আমার মা মারা যান । তখন আমি আর্থিক ভাবে একেবারেই রিক্ত । অফিসের লোকেরা চাঁদা তুলে প্লেনে ক'রে ক'লকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা করে।

সব মিটে যাওয়ার পরে জোড়হাটে ফিরে আসি । এবারে মাথা গোঁজার ঠায় লাগবে । বাঙ্গালীরা যেখানে বেশী ভীড় ক'রে থাকে, সে'রকম জায়গায় অফিসের লোকেরা একটা বাসা খুঁজে দিল ।

অঞ্চলটির নাম বাঁশবাড়ী । সুরক্ষিত । একটা ঘর । একটা মাঝের ঘর । রান্নাঘরও ছিল । খুব নীচু ফ্লোর । সামনে গোয়াল । যথেষ্ঠ মশা এবং মাছি । বাকী সুবিধা বাড়ীওয়ালার সাথে কমন । জল প্রচুর লৌহসমৃদ্ধ । বারংবার ফিল্টারের পরে তাকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে হয় ।

আমি ম'নমরা হয়ে প্রথম সন্ধ্যায় যখন চুপচাপ ব'সে তখন হোল লোডশেডিং । চারিদিকে অন্ধকার । তখন পিদিম কিনিনি । মোমবাতি ছিল । তাতেই অন্ধকার উজ্জ্বল হয়ে উঠল । কিছুক্ষন পরে শুরু হোল শিয়ালের ডাক । ওরা কোথায় ঠাহর হোল না, কিন্তু আওয়াজের প্রাবল্যই তাদের সংখা বাতলে দিল ।

মা মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে জোড়হাটের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি নিবাস থেকে এই শিয়ালের আওয়াজ শুনে দীর্ঘ পত্র লিখেছিলুম । মাকে জানিয়েছিলাম আমি ১৯৭০ এর হালিশহর নবনগরে ফিরে এসেছি ।

তুমিই বল, ১৯৭৮ এ দিল্লী, '৮৪ তে নাগপুর । এবারে জোড়হাট । তাও বাঁশবাড়ী ! অধঃপতনের একশেষ । হয়ত এটার দরকার ছিল ।

তুমি অনেক পরে এলে জোড়হাটের বাঁশবাড়ীতে । তোমার প্রবেশ নয়, আবির্ভাব । সঙ্গী অয়ন । একাকীত্ব ঘুচলো । কিন্তু.....।

আসলে হোল কি, সামনের গোয়ালে গোরুর বাচ্চা হোল । এতে আমার কোন হাত ছিল না । কি ক'রবো বল ? বাচ্চাটি জন্মাতেই ছুটতে শুরু কোরল । যেমনটি হয় আর কি। এ পর্যন্ত ঠিক ছিল । এক'দিন কি হোল, বাছুরটা বাইরের ঘরে ঢুকে পড়ল। এটাও ঠিক ছিল । ঢুকেছিস যখন বেরিয়ে আয়, তা না বেডরুমে ঢুকে পড়ল । আসলে এত পরিস্কার ঘর দেখে নি কখনো । শুধু কি তাই ? তারপর রান্নাঘরে এন্ট্রি নিল । যেন অলিম্পিকের ম্যরাথন রেস।

আমি তোমার মুখে দিকে তাকাতে পারছিলাম না । ভয়ে এবং লজ্জ্বায় ।

আর একদিন রান্নাঘরে ব্যাঙ্ ঢুকল । তাকে নীচু হয়ে তাড়াতে গিয়ে খুব হেনস্থা হোল আমার । বাঙ্গাল বাড়ীওয়ালা খোকাদা এসে বলে, নীচু হইয়া কি করতে আসেন ? রেগে গিয়ে বললাম, ব্যাঙ্ ঢুকসে, হ্যার লগে দুইটা কথা কইতে আসি । কী রান্নাঘর বানাইসেন ? বলে, তাতে কী হইসে ? হ্যারা তো ঢুকবই । আমি কি ব্যাঙ্ তাড়ামু নাকি ? হেইটা আমার কাম না । বুঝলেন নি ?

তুমি বললে, এ বাড়ীতে থাকব না । সেইদিনই একজন অসমীয়া কলিগের সাহায্য Assamese area তে খুব সুন্দর বাড়ী ভাড়া ক'রে ফেললাম ।

ওখানকার বাঙ্গালী বন্ধুরা অকারন ভয় দেখিয়েছিল । অহমিয়রা অনেক পরিস্কার । বাড়ীঘর সুন্দর ক'রে রাখে ।

নতুন বাড়ীতে এসে শীঘ্রই বাঁশবাড়ীর স্মৃতি মন থেকে মুছে গেসল । মনে পড়ে ?

অলমিতি

নাগপুর
(২৬।৮।২৪)

DO NOT COPY

চতুর্বিংশতি (২৪)
প্রসঙ্গ: গৃহস্থের গৃহপ্রবেশ

হে বন্ধু,

প্রথম বাড়ী বা ফ্ল্যাট স্বপ্নের মত। হঠাৎই হয়েছিল। অনেকে সাহায্য করেছিলেন বটে।

১৯৯৮ র কথা। হঠাৎই একজন রিটায়ার্ড সিনিয়র কলিগ ফোনে জানালেন, তোর জন্য ফ্ল্যাট ঠিক করেছি। রেডি হয়ে থাক। আমি আসছি। এসে তোকে নিয়ে বিল্ডারের অফিসে যাব।

তারপরে ইতিহাস। স্বপ্নের ম'ত। ফ্ল্যাটের দাম সাত লাখ টাকা। তখন আমার ব্যান্‌কে মাত্র হাজার দু'য়েক টাকা হবে। প্রফিডেন্ট ফান্ডে মেরে কেটে লাখ খানেক হবে। সব মিলিয়ে সে এক মহা টেনশন।

অযাচিত উপকার এবং সাহায্য পেয়েছি। অপ্রত্যাশিত ভাবে।

পরে আমরা অসম্পূর্ন অবস্থায় ফ্ল্যাটের ছাদে এক মারাঠি যুবকের সাহায্যে ভূমি পূজো করেছিলাম। ফ্ল্যাটে গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠানে করেছিলাম অনেক পরে। সেই ছিল গৃহস্থের গৃহপ্রবেশ। সেই পূজোর পরেই সরকারী নির্দেশে আমার মাইনে এবং বাড়ী তৈরীর লোনের টাকার পরিমান বৃদ্ধি পেল।

তারপর বাড়ী সাজানো। পুরোটায় তোমার কাজ। ছেলে-মেয়েদের বড় করা, শিক্ষা, তাদের সেট্‌ল করানো ঐ বাড়ীতেই। প্রায় ১৬-১৮ বছরের কথা।

অনেকদিন আগের কথা। মনে হয় যেন সেদিনের।

কষ্ট ছিল। কাটিয়ে দিয়েছি। শারীরিক অসুস্থতা এবং তার নিবারন সব ঐ বাড়ীতেই।

এখন নতুন বাড়ীতে এসেছি। তথাপি মাঝেমাঝেই ঐ বাড়ীর কথা মনে পড়ে যায়।

তোমার এমনটা হয় ?

অলমিতি
নাগপুর
(২৬।৮।২৪)

DO NOT COPY

পঞ্চবিংশতি (২৫)
প্রসঙ্গ: পাখীর পেটে প্রথমবার

হে প্রিয়ে,

ভাল নয় সে অভিজ্ঞতা । মানে প্রথম হাওয়াই জাহাজে ওঠার কথা বলছি ।

কারন আছে । তখন আমি বিধ্বস্ত । আমার বদলী হয়েছিল নাগপুর থেকে জোড়হাটে । আমার মা ছিলেন হাঁপানি রুগী । নাগপুরের শুকনো আবহাওয়াতে সুস্থ হয়ে উঠেছিল । বদলী ঠেকানোর চেষ্টায় আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম । অবশ্য মার অসুস্থতা ছাড়া আরো কারন ছিল ।

বহু লড়াই, আবেদন-নিবেদনের পালা শেষে আমি জোড়হাটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলুম । ১৯৯২ এর জানুয়ারীতে যাব , এরকমটায় ঠিক হোল । প্রথমে আমি, পরে পরিবার । নাগপুর থেকে ক'লকাতা ট্রেনে, ওখান থেকে প্লেনে ।

জোড়হাটে যাওয়া খুবই সমস্যার বটে । বিশেষত যারা নীচু পদে চাকরি করে, যেমন আমি । কোলকাতা-জোড়হাট প্লেনে যাওয়া যায় । আমার পক্ষে ব্যয়সাপেক্ষ ।

আমি মানসিকভাবে পর্যদুস্ত ছিলাম । শ্বশুরমশায় একটা প্লেনের টিকিট কেটে দিয়েছিলেন । বেশ মনে আছে তখন ঐ দূরত্বের জন্য ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ৭৩৫ টাকা ভাড়া নিত ।

ক'লকাতা বিমানবন্দরে ভাই এবং শ্বাশুড়ী ছাড়তে এসেছিলেন । এটুকু মনে পড়ছে যে অনেক প্রতীক্ষার পরে বিমানসেবিকা ঘোষনা ক'রলেন , পাখী এবার উড়বে ।

জল এবং স্থলপথের অভিজ্ঞতা ছিল । আকাশে বাস্তবে কখনো উড়িনি । পাইলট কি যেন ব'লল । ইংরাজীতে । কিছুই বোঝা গেল না ।

হঠাৎ ক'রে পাখি ভীষন জোড়ে ছুটতে শুরু কোরল । মাঠের ছাড়া গরুর মত । সে কী দৌড়, সে কী দৌড় । তারপর আমার শরীরটা হঠাৎ উপরে উঠে গেল, উঠতেই থাকল, আর জানলা দিয়ে সব দৃশ্য ভাস্বর হয়ে উঠল । সব কেমন ছোট ছোট হতে থাকল ; তারপর মৃদু ঝাঁকুনি , ধীরে ধীরে সব অদৃশ্য হয়ে গেল । বুঝলাম , আমি আকাশচারী হয়েছি ।

পরে জলযোগ , ইত্যাদী । চোখ বুজে প্রতীক্ষা । বিমানসেবিকার ফিসফিসানি , সহযাত্রীদের মৃদু গুন্জন । বিমানের প্রায় সমতল হয়ে চলা । বোধ হ'ল বিমান কোন এক বিশেষ জায়গায় স্থির হয়ে আছে ।

বিমানের আলো একবার মৃদু হোল , আবার উজ্জ্বল হোল । আমি অবাক বিস্ময়ে বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রার প্রথম সরিক হ'লাম । মনে হোল আমি ঘুমিয়ে পড়েছি ।

পাইলটের আওয়াজে নিদ্রাভঙ্গ হোল । কিছুক্ষনের মধ্যেই বিমান জোড়হাট অবতরন ক'রবে । প্রবল ঝাঁকুনি , নিম্নাবতরন , এবং মানানসই ধাক্কার সাথে সেবিকার ঘোষনায় বুঝলাম স্থলের জীব স্থলে ফিরেছে । মার কোলে । পৃথিবীর কোলে । কী শান্তি !

অস্বাভাবিক মানসিক পরিস্থিতিতে বিমানের প্রথম সফর একটু দুঃখের ছিল, প্রিয়জনদের থেকে দূরে যাওয়ার কারনে । রোমাঞ্চ কম ছিল , অবাক হওয়ার মনই ছিল না ।

আমি জোড়হাটে পৌঁছলাম বিকেল তিনটের সময় । তিরিশে জানুয়ারী ,ঠান্ডা, বৃষ্টি ।

এ বিমান সফরে তুমি ছিলে না । ছিল তোমার সুখস্মৃতি আর ভালোবাসা ।

নতুন অধ্যায় শুরু হোল আমার । কিন্তু সে আর এক গল্প ।

অলমিতি

নাগপুর

(২৬।৮।২৪)

DO NOT COPY

ষড়বিংশতি (২৬)
প্রসঙ্গ: মাষ্টারমশায়ের মাষ্টারী

সুন্দরীশ্রেষ্টা,

স্কুলের গল্প অন্যত্র লিখেছি । আমার মাষ্টারমশায় সুনীলবাবু সম্পর্কেও কিছু কথা বলেছি সেখানে । বিস্তারিত বলার অবকাশ আছে ।

আমার স্কুলজীবনে যত মাষ্টারমশায় দেখেছি এবং পেয়েছি, সুনীলবাবু ছিলেন সর্বোত্তম । পুরো নাম সুনীল কুমার সাহা । চোখে চশমা, গালময় দাড়ি, এবং অবিন্যস্ত চুল । পরিধানে হাফ শার্ট ,বাঁ হাতে চামড়ার ব্যান্ডের ঘড়ি । চোখের দৃষ্টি প্রখর ; সবটা এক নজরে দেখে নেওয়ার চেষ্টা, পরিমিত হাসি, অনেকক্ষেত্রে মুখমন্ডল গম্ভীর । এ মানুষের সাথে হঠাৎ করে বন্ধুত্ব কঠিন কাজ । দূরত্ব বজায় রাখায় শ্রেয় । আমরাও তাই করতাম ।

যখনকার কথা বলছি উনি তখন গ্র্যাজুয়েট ছিলেন । পরে নিয়ম হয় পোষ্ট- গ্র্যাজুয়েট না হ'লে মাষ্টারি করা যাবে না । স্যার পরে স্পেশাল অনার্স করেন এবং তারও পরে পোষ্ট- গ্র্যাজুয়েট এর পড়া শেষ করেন । কী অধ্যবসায় ।

কিন্তু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ওসব ডিগ্রির কোনো অর্থ নেই সুনীলবাবুর মত শিক্ষকের জন্য । ওনাকে নীচু ক্লাসে পাই নি । ক্লাস নাইন থেকে ইলেভেনকে অংক শেখাতেন । প্রাইভেট পড়ানোর সময়, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, অংক, বায়োলজী এবং মেকানিক্স এ ছিল অবাধ বিচরন ।

জুহুরী ছিলেন । ছাত্রদের নার্ভ বুঝতে পারতেন । কাকে কতটুকু পড়াতে হবে খুব ভালভাবে জানতেন ।

একটা নিয়ম ছিল ওনার । ক্লাস নাইন থেকে ইলেভেনের ফার্ষ্ট হওয়া ছাত্রকে বিনাপয়সায় পড়াতেন । আমি ফিজিক্সে খারাপ করেছিলাম ক্লাস নাইনে । মা'কে জানায় বিষয়টা । মা দাদাকে বলেন । সুনীলবাবু সব শুনে বলেন, ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দে ।

দেখা বললেই তো আর হয় না । স্যার ছিলেন বাঘ । কে যাবে ওনার সাথে দেখা করতে । আসলে ওনার বাইরেটা ছিল ভয়ানক । মানুষটা ছিলেন খুব ভালো । টিচার্সরুমে গিয়ে দেখা করার প্রশ্নই ওঠে না । স্যার সবাইকে তুমি ব'লতেন । ফলে সম্পর্কের দূরত্বটা থেকেই যেত । অনেক পরে তুই বলেছেন ।

DO NOT COPY

সে যাইহোক, ওনার স্পেশাল কোচিংএ হায়ার সেকেন্ডারীর তরী পার করেছিলাম। সপ্তাহে তিনদিন পড়াতেন। নিতেন ১৫ টাকা। আমার সামর্থ্য ছিল না কিছু দেওয়ার।

দিয়েছি পরীক্ষার ফল। ঐ আমার গুরুদক্ষিনা। স্কুলের মান রেখেছি, সুনীলবাবুরও।

দুঃখ এই যে, স্যারের জন্য কিছু করতে পারিনি।

কয়েক মাস আগে উনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমার জীবনের যতটুকু সাফল্য পেয়েছি তার অধিকাংশই ওনার জন্য।

আমি ভাগ্যবান ওনাকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম। এমন শিক্ষক প্রতি স্কুলে যেন বারবার ফিরে আসে।

অলমিতি
নাগপুর
(২৬।৮।২৪)

DO NOT COPY

সপ্তবিংশতি (২৭)
প্রসঙ্গ: পাঁচপুরুষের পাঁচকাহন

সুনন্দিতা,

আগেকার দিনে সাধারনতঃ মেয়েদের অনেক কম বয়সে বিয়ে হোত । ফলতঃ সন্তান-সন্ততি তাড়াতাড়ি হোত, তাদের নাতি-নাতনি, পো-নাতি ইত্যাদীর সংখ্যাও বেড়ে যেত । এবং এ ঘটনা যখন হোত তখনো বাড়ীর পঞ্চম পুরুষ বহাল-তবিয়তেই থাকতেন ।

আমাদের বাড়ীতেও এমনটি হয়েছিল । সেই গল্পই তোমাকে ব'লব আজ ।

প্রথমেই আসছেন আমার বড়মা । মানে আমার মায়ের ঠাকুমা । তারপর আমার দিদিমা, মা, দিদি এবং তার ছেলে মানে আমার ভাগ্নে । লিখলে সারনীতে এমনটা দেখতে হবে ।

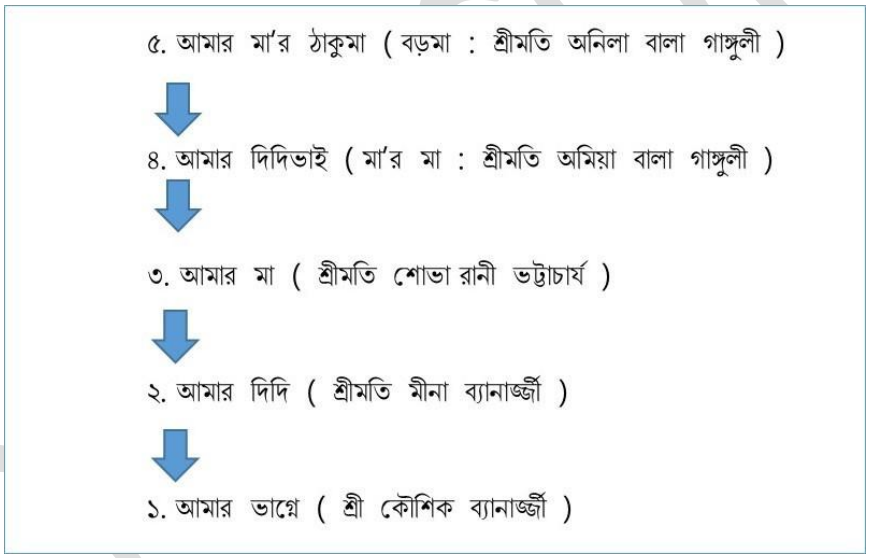

ভালো ক'রে দেখলে বুঝবে, এটা খুব ভাগ্যের ব্যাপার । এখানে যে উদাহরনটা দিলাম সেটা মার মা'য়ের দিকের ।

এবারে ফিফ্‌থ জেনারেশনের এর পূর্বসূরী হিসেবে প্রথমজন মানে মা'র ঠাকুমার কিছু কথা লিখে ফেলি ।

অনিলা বালাকে দেখেছি ষাটের দশকে । ছোট ক'রে ছাঁটা চুল, ফরসা গাত্রবরন, সেমিজ পরিহিতা, ঈষৎ খর্বকায়া ষাঠোর্ধের মহিলা । মুখে তামাকের গুড়ো থাকত । টাকা-পয়সার হিসেবে বেশ দড় ছিলেন । সে আমলে ওনার নৈহাটীতে ব্যান্‌ক অ্যাকাউন্ট ছিল । হিসেবের কাজে আমার মা ছাড়া কারো উপর ভরসা ছিল না ।

ব্যান্‌কে মাকে নিয়ে যেতেন, গঙ্গাস্নানেও সঙ্গী মা, এমনকি বাজারেও । মা ছিলেন ওনার প্রিয় নাতনী ।

অনিলা বালা কালো লোকদের (বিশেষত মেয়েদের) পছন্দ ক'রতেন না । ওনার কথার অবাধ্য হলে বকাবকি ক'রতেন ।

অনেক পরে জেনেছিলাম উনি আমার মা'র নিজের ঠাকুমা ছিলেন না । সৎঠাকুমা । ভালোবাসা অবশ্য তাতে কমেনি ।

ওনার নিজে বৌমাকে (মা'র কাকীমা) প্রচন্ড শাসনে রাখতেন । ভীষন মুখ ছিল বড়মা। আদর্শ বৌ-কাঁটকি শ্বাশুড়ী ছিলেন উনি । মার কাছে গল্প শুনেছি মা'র কাকীমা (মানে বড়মার বৌমা) নিজের বড়ছেলের অন্নপ্রাশনের আনন্দনাড়ু একটা মুখে দিয়েছিল । মা'র কাকীমা তখন নতুন মা হয়েছে, কি বা বয়স, ইচ্ছে হয়েছে নাড়ু খাবে । সবার সামনে বড়মা বৌমার মুখে হাত ঢুকিয়ে নাড়ু বার করলেন । বললেন, অন্ন, (কাকীমার নাম অন্নপূর্না) তোর এত নোলা, বাড়ীতে এখনো কারো খাওয়া হোল না । তুই অমনি নাড়ু মুখে দিলি ?

শুনেছি নিজের পতিদেব যোগেন গাঙ্গুলীকেও কড়া শাসনে রাখতেন ।

আমাদের উপরেও চোটপাট ক'রতেন । বলতেন, আমি অশৈলে দেখতে পারি নে । যশোহরের ভাষা মাঝেমাঝে বলে ফেলতেন । যেমন, পূবির ঘর, দুধির বাটী, কুলির অম্বল, ইত্যাদী ।

উনি বোধহয় ১০০ ছুঁইছুঁই এ মারা গেসলেন ।

সে সব কবেকারের কথা ।

তুমি দেখেছ ওনাকে । তোমাকে পিঠের কাপড় সরিয়ে গায়ের আসল রং দেখেছিলেন । অনেকক্ষন ধরে । উজ্জ্বল টিউব লাইটকে বিশ্বাস করেননি । অন্নকে হ্যারিকেন ধ'রতে বলেছিলেন । বেশ কিছু সময় ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে তুমি পাস করেছিলে । দেখে আমার মাকে বললেন, রানু, তোমার এ বৌটি ফরসা হয়েছে । তোমাকে দশটা টাকা উপহার দিয়েছিলেন ।

আমার বৌদিকে দু'টাকা দিয়েছিলেন । পরে সব শুনে বৌদি বলেছিলেন, আমি কালো তাই দু'টাকা, তুমি ফরসা বলে দশ টাকা ।

এখন পাঁচপুরুষের অনেকেই গত হয়েছেন । আজ এদের পাঁচকাহন অতীতের গর্ভে বিদ্যুতের আলোকে তলিয়ে গেছে ; সে হ্যারিকেনও নেই, বড়মাও নেই ।

অলমিতি
নাগপুর
(২৭ । ৮ । ২৪)

DO NOT COPY

অষ্টবিংশতি (২৮)
প্রসঙ্গ: কর্তামশায়ের কত কথা

হে লক্ষীদেবী,

মার ঠাকুরদাদার নাম ছিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী । আমাদের কর্তামশায় । উনি রেল কোম্পানীতে কাজ ক'রতেন । তখন ভারত স্বাধীন হয় নি ।

যোগেনবাবু যশোহরের লোক ছিলেন । ইনি পরে এপার বাংলায় আসেন । প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পরে দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ করেন । নূতন স্ত্রীর গর্ভে দু'টি সন্তান হয়. একটি পুত্র এবং কন্যা ।

আমার স্মৃতিতে যোগেনবাবু বৃদ্ধ । তিনি সক্ষম ছিলেন . মাঠে ঘুরতে দেখেছি । পরিবারে একটু যেন অবহেলিত ।

আমরা পাশেই ছোট্ট ঘরে থাকতাম । ছোট ঘরের ততোধিক ছোট রান্নাঘরের জানলায় এসে বহুবার মা'র কাছে খেতে চেয়েছেন । হয় আমার স্মৃতিতে আছে, অথবা মার কাছে গল্প শুনে স্মৃতির তন্তুতে জাল বুনে লিখলাম । বোধহয় নিজের বাড়ীতে ওনার ঠিকমত যত্ন হোত না ।

আমার মা যখন বাবাকে মাসের শুরুতে বলতেন, পকেটে কত টাকা আছে দেখাও । বাবা দেখাতেন, মা কিছুটা রেখে বাকীটা বাবাকে দিয়ে দিতেন । বাবা হাসতে হাসতে বলতেন, আমায় যোগেন গাঙ্গুলী ক'রে ছেড়ে দিল রে ।

আসলে যোগেনবাবুর স্ত্রী মানে মা'র ঠাকুমা খান্ডারনী মহিলা ছিলেন । যোগেনবাবুকে হাতখরচা কিছুই দিতেন না । সেই জন্যই বাবা বলতেন, আমায় যোগেন গাঙ্গুলী ক'রে ছেড়ে দিল রে । বড়মা বাড়িটিও নিজের নামে করে নিয়েছিলেন । ওটাই ছিল আমার দ্বিতীয় মামাবাড়ী ।

যোগেনবাবু বৃদ্ধবয়সে সত্যি সত্যিই নিস্কর্ম হয়ে গেসলেন । বার্ধ্যক্য এবং অবহেলায় ।

যোগেনবাবু আমার মাকে স্নেহ ক'রতেন ।

অলমিতি
নাগপুর
(২৭।৮।২৪)

DO NOT COPY

নববিংশতি (২৯)
প্রসঙ্গ: আমার মার মামাবাড়ী

প্রিয়ভাষিনী,

আমার এবং আমার মা'র মামাবাড়ী সিউরিতে ছিল । পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার মহকুমা শহর । মা'র দাদামশায় ছিলেন বড়লোক । বিরাট বাড়ী ছিল তাঁর । পুকুর ছিল । পুকুরে মাছও ছিল । রাঢ় দেশে যা হয়, গরমে পুকুরে জল ক'মে যেত । তখন মাছের সমস্যা হোত ।

ভদ্রলোক ইংরেজ ভক্ত ছিলেন । বাড়ীতে রবিবাবুর গান বাজানো এবং শোনার অনুমতি ছিল না । মা'র দিদিমা তামাক সেবন করতেন । সখী পরিবৃতা হয়ে থাকতেন । এসব মা বলেছিলেন, তোমায় লিখছি ।

দাদামশায়ের অনেক পুত্রসন্তান হয়েছিল । সবাই কোন না কোনওভাবে মারা যায় । তাই বংশ রক্ষার তাগিদে সবচেয়ে ছোট ছেলের খুবই কমবয়সে বিবাহ দিয়েছিলেন । তাঁর স্ত্রী মানে মা'র মামীমা এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ার পূর্বেই মামা মারা যান ।

মা'র মামীকে একবারই দেখেছিলুম আমি । মা'রই সমবয়স্ক । বিরাট বাড়ী । চারিদিকে উঁচু পাঁচিল । অনেক গাছ-পালা ছিল মা'র মামাবাড়িতে । ভদ্রমহিলা আমায় খুব আদর ক'রেছিলেন । আমি বোধহয় তখন সাত ক্লাসে পড়ি । মা'র মামাবাড়ীর পাশের জমিটাতে আমাদের মামাবাড়ী ছিল । দাদামশায় রায়বাহাদুর উপাধি পেয়েছিলেন । ধনী এবং বিত্তশালী জমিদার ছিলেন ।

শুনেছি ঐ বাড়ীতেই মা'র ছেলেবেলা কাটে । মা শিউড়ির আর. টি. গার্লস স্কুলে প'ড়েছেন । সে অর্থে মা ও বাবা দুজনেই বাংলাদেশের যশোহরের লোক হ'লেও ছোটবেলা থেকেই এপারে মামাবাড়ীতে মানুষ হয়েছেন ।

অলমিতি
নাগপুর
(২৭। ৮। ২৪)

DO NOT COPY

ত্রিংশতি (৩০)
প্রসঙ্গ: তোমায় কেন ভালোবাসি

পরমপ্রিয়ে,

স্কুলে থাকতে বাংলা রচনা লিখতে দিতেন দিদিমনি। আমার প্রিয় কবি। তার শুরুটা এ'রকম হোত। আমার এখনো মনে আছে।

"আমার প্রিয় কবি অমুক। আমার খুব ভালো লাগে ওনার রচনা। এছাড়াও আরো অনেক কারন আছে। কিন্তু উনি কেন প্রিয় সেটা বিস্তারিত লিখে বোঝাতে পারব না।

ঠিক এই কারনেই তোমাকে কেন ভালোবাসি লিখে বোঝানো যাবে না। অনেক কারন থাকতে পারে। তুমি সুন্দর, রেগে যাও সহজেই, হাস কম, বল কম। তোমার তূণে অনেক কিছু বেশী, অনেক কিছু কম।

এই কম-বেশী নিয়েই ভাল আছি, ভালবাসি।

তোমার ধৈর্য্য আছে, সামান্য কারনে ভীত হও না। আমি হই। সহ্য শক্তি অনেক বেশী তোমার।

তুমি না, আসলে, খুব ভালো; তাই তোমাকে ভালবাসি।

অলমিতি।
নাগপুর
(২৮।৮।২৪)

DO NOT COPY